রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

গোপালচন্দ্র রায়

নয়া উদ্যোগ
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

অধ্যাপক ডঃ দীপঙ্কর রায় এম.এস-সি., পি-এইচ.ডি. (ইউ.এস.এ.)
ও ঊর্মি রায় এম.এস-সি. কর্তৃক প্রকাশিত
সাহিত্য ভবন
২৬ মদন বড়াল লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ:
২৫শে বৈশাখ ১৯৫৬

মুদ্রক:
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক
অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহভাজনেষু

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নজরুল নিজে বলেছেন—'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে; যেমন করে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করেছি।'

রবীন্দ্রনাথও গভীর স্নেহে নজরুলকে কাছে ডেকেছেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকার জন্য তাঁকে কতবার বলেছেন।

স্বদেশ-ভক্ত বিপ্লবী নজরুল দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে কারাবরণ করলে, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতি-নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করেছেন।

কারা কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করলে, তখন রবীন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। অনশন ভঙ্গ করবার জন্য নজরুলকে টেলিগ্রামও পাঠিয়েছিলেন।

উভয়ের মধ্যে এই এত নিবিড় শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকলেও, একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা সামান্য ভুল সংবাদ প'ড়ে, নজরুল রবীন্দ্রনাথের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং তা কিছুটা কঠোর ভাষাতেই লিখে প্রকাশও করেন। অবশ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিনয় এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল যথেষ্ট।

পরে নিজের ভুল বুঝে নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে, রবীন্দ্রনাথ পূর্ববৎ সস্নেহেই তাঁকে গ্রহণ করেন। সে ইতিহাস বইয়ে বিস্তৃত বলেছি।

এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রায় সমস্ত দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা প্রভৃতি নিয়ে যেমন আলোচনা করেছি, তেমনি উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে যে যে অবাস্তব ও আজগুবি কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলিরও অসত্যতা দেখাবার চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নজরুল যে সব কবিতা লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও যে যে কবিতা ও গান লেখেন, সেগুলির কথাও বইয়ে বলেছি। বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, উভয়ের দুটি সুন্দর চিঠি যেমন আছে, তেমনি এই চিঠির প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের একটি মর্মস্পর্শী কবিতাও রয়েছে।

নজরুলের সময়কার দেশের সাহিত্যের ইতিহাস, তাঁর নিজের সাহিত্য, তাঁর সাহিত্য নিয়ে কারও প্রশংসা, কারও বা তাঁর প্রতি তীব্র আক্রমণ, তাঁর নিজের ব্যক্তিজীবন প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু এই বইয়ে এসেছে।

নজরুলের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতায় নজরুল-সংক্রান্ত লেখকরা ও প্রকাশকরা কিভাবে পংক্তিবাদ, শব্দের বিকৃতি প্রভৃতি ঘটিয়েছেন তা নিয়েও আলোচনা করেছি। নজরুল সম্পর্কে তাঁর কোন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এবং অন্যদেরও ভুল উক্তি দেখিয়েছি।

১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে মে) বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। সেই হিসাবে এখন ১৪০৫ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ থেকে দেশের নানা স্থানে নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

এই উপলক্ষেই কিছুদিন আগে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ দিলীপকুমার সিংহ শান্তিনিকেতনে তাঁদের আসন্ন নজরুল জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতা দিতে যাবার জন্য আমাকে বলেন।

গত বৎসর এই উপাচার্য মহাশয়ের আমন্ত্রণেই শ্রীনিকেতনে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। বক্তৃতার বি য় ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

এবার উত্তরে তাঁকে জানাই, যেতে হয়ত পারবো না। তবে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রসঙ্গ নিয়ে একটা লেখা পাঠিয়ে দিতে পারি। সেই লেখা সভায় পড়তে পারেন।

দিলীপবাবুর জন্য ঐ লেখা লিখতে গিয়েই, পরে রবীন্দ্র-নজরুল নিয়ে একটু বড় আকারেই লিখে এই বইটি রচনা করি। নজরুল জন্ম-শতবর্ষে বইটি প্রকাশ করলেন আমার পুত্র দীপঙ্কর রায় এবং বধূমাতা ঊর্মি রায়।

এই বইএর পরিবেশনার ভার নিয়েছেন, কলকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'নয়া উদ্যোগে'র স্বত্বাধিকারী পার্থশংকর বসু।

গোপালচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ...	৯
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ....	২৪
কারাগারে নজরুল : রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ...	৩৫
রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের একটি চিঠি...	৪৩
রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে নজরুল...	৪৯
নজরুলের একটি রচনা : বড়র পিরীতি বালির বাঁধ...	৫২
নজরুলের কয়েকটি কবিতা ও গান...	৮১

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ

কলকাতায় আকাশবাণীতে সকালের দিকে 'প্রাত্যহিকী' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ঐ বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিষয় নির্বাচন ক'রে দিলে এক পক্ষ ধ'রে (আগে ছিল এক মাস) সেই বিষয়ের উপর বিভিন্ন জনের লেখা পড়া হয়। গত মে মাসের (১৯৩১) শেষ পক্ষে অর্থাৎ ১৬ই মে থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত ঐ প্রাত্যহিকীর বিষয় ছিল—কবি নজরুল ইসলামের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে—জ্যৈষ্ঠের ঝড় বা কাজী নজরুল।

ঐ সময় আকাশবাণীর ঐ প্রাত্যহিকীতে প্রতিদিনই নজরুলের উপর লেখা নানা জনের নানা রচনা বা চিঠি পড়া হয়েছে। একাধিক দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাতের একটা কাহিনী একাধিক লোকের লেখায় পড়া হয়েছে শুনেছি। এই কাহিনীটির উৎস কোথায় ঐ পত্র প্রেরকদের কেউই অবশ্য তার উল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে আমি যতটা অনুমান করতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই—

কলকাতার এক পুস্তক সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-স্মৃতি' নামে একটা বই আছে। বিভিন্ন জনের নজরুল সংক্রান্ত রচনা নিয়ে এই বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বনাথ দে। এই বইয়ে তখনকার 'বিজলী' পত্রিকা গোষ্ঠীর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'পুরোনো কথা' নামে একটা লেখা আছে। আমার দৃঢ় ধারণা প্রাত্যহিকীর আলোচ্য লেখকরা অবিনাশবাবুর এই লেখা পড়েই ঐ কথা লিখেছেন। না হ'লে বলতে হবে, এঁরা অন্যত্র অবিনাশবাবুর মূল লেখা, ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুরোনো কথা' প'ড়েই এ কথা লিখেছেন। কেন না, অবিনাশবাবুই এই কাহিনীটির লেখক।

অবিনাশবাবু লিখেছেন—'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হ'লে, পরের দিন সকালে এসে কবি চারখানা 'বিজলী' নিয়ে গেলো, বললে 'গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ ফিরে এসে বোলো, তিনি দেখে কি বললেন।'

বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলে নজরুল।

তাঁর বাড়িতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' ব'লে চেঁচাতে থাকে। উপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন, কী হয়েছে?

'আপনাকে হত্যা করবো, গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।'

'হত্যা করবো, হত্যা করবো কি? এসো, ওপরে এসো বসো'।

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি, আপনাকে হত্যা করবো, বসুন, শুনুন।'

কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে 'বিজলী' হাতে নিয়ে উচ্চস্বরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো!

তিনি স্তব্ধ-বিস্ময়ে কাজীকে জড়িয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, হ্যাঁ কাজী, তুমি আমায় সত্যই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার কবিতায় জগৎ আলোকিত হোক্, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।'

এখন এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

নজরুল ত তখনকার অনেক কবি সাহিত্যিকের মতো রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলেই সম্বোধন করতেন। তাই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব না ব'লে, নজরুল হঠাৎই রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে ঢুকে 'গুরুজী' 'গুরুজী' ব'লে চীৎকার করেছিলেন? এ বিশ্বাস হয় না।

নজরুল বন্ধু মহলে বা অন্যত্র যতই উদ্দাম ও উচ্ছল প্রকৃতির হউন না কেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি যদি সেদিন সত্যই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন, তাহলে তিনি বাড়িতে ঢুকে আগে কারও কাছে খোঁজ নিতেন, রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে আছেন কি না? বাড়িতে ঢুকেই ঐভাবে 'গুরুজী' 'গুরুজী' ব'লে চীৎকার করতেন না।

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' রচনায় লিখেছেন— 'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে। যেমন করে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে পূজা করে।'

যে নজরুল ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথকে এত শ্রদ্ধাভক্তি করেছেন, সেই নজরুলই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হঠাৎই আপনাকে হত্যা করবো, হত্যা করবো বলতে পারেন? এও বিশ্বাস হয় না।

নজরুল সত্যই যদি সেদিন তাঁর বিদ্রোহী কবিতা প'ড়ে শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন, তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলতেন—গুরুদেব, শুনুন, আমি একটা কি রকম কবিতা লিখেছি। বা এই ধরণেরই কোন কথা।

আর 'হত্যা করবো' 'হত্যা করবো' এটাই বা কি কথা! নজরুলের মুখে এতই কি ভাষার অভাব হয়েছিল, যে, (ঘটনাটাকে সত্য বলে মানলেও) 'হত্যা করবো' 'হত্যা করবো' ছাড়া অন্য কথা বলতে পারলেন না!

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকে নজরুলের গুরুজী গুরুজী চীৎকার এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে 'আপনাকে হত্যা করবো, হত্যা করবো'—এ কথা যেমন বিশ্বাস

করা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলেছিলেন — কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন, — এ কথাও আদৌ বিশ্বাস্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ও-ভাষা বলতেই পারেন না।

যাই হোক, এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা হ'ল — অবিনাশবাবু যে বলেছেন, 'বিজলী'তে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরদিন নজরুল ঐ সংখ্যা 'বিজলী' পত্রিকা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন, এবং গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রোহী কবিতা প'ড়ে শুনিয়ে ছিলেন। এ কথা ঠিক নয়। কারণ —

১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারির সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অবিনাশবাবুর কথা অনুযায়ী নজরুল ৭ই জানুয়ারি সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ৭ই তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ত ছিলেনই না, এমন কি ঐ তারিখের আগে পরেও কয়েকদিন ক'রে কলকাতায় ছিলেন না।

ঐ সময়কার কথায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী—৩য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন —

'প্রায় আড়াই মাস (৮ সেপ্টেম্বর হইতে ২৮ ডিসেম্বর) একাদিক্রমে শান্তিনিকেতনে কবি বাস করিতেছেন — শরীর মন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই কয়েকদিন বিশ্রামের জন্য গেলেন শিলাইদহ। সাত দিন পরে শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিনিকেতন হইতে বালিকা রাণুকে এই পত্রখানি লেখেন — (২২ পৌষ ১৩২৮)।

'আমি নদী ভালোবাসি। ...তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে — এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব।'

বালিকা রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার আর একটি চিঠির উল্লেখ করেও প্রভাতবাবু লিখেছেন — 'পৌষ সংক্রান্তির (১৪ জানুয়ারি ১৯২২) দিন নাটকটি শেষ করিয়া একপত্রে লিখিতেছেন, 'আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম — শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি।... এর নাম 'পথ'। পরে পথের নাম দেন 'মুক্তধারা'।

পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট নাটকটি পড়িয়া শোনান। তৎপর দিবস কলিকাতায় গেলেন সেখানে বন্ধুমহলেও শোনানো চাই।... দুই দিন পরেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।' (পৃঃ ১১৫)

এখানে প্রভাতবাবুর লেখায় তার পর দিবস কলিকাতায় গেলেন, হ'ল — কবি ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায় যান।

আমাদের মনে হয়, নজরুল হয়ত জোড়াসাঁকোয় গিয়ে একদিন তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প’ড়ে বা আবৃত্তি ক’রে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েও থাকতে পারেন। তবে সে ঐ ১৯২২-এর ১৫ই জানুয়ারির পরে। আর ঐ গুরুজী গুরুজী ব’লে চীৎকার ক’রে বা হত্যা করবো, হত্যা করবো ব’লেও নয়।

অবিনাশবাবুর বর্ণিত, তাঁর কাছে নজরুলের বলা ঐ গুরুজী ইত্যাদির কাহিনী যদি সত্য বলেই মানতে হয়, তাহলে বলবো — নজরুল হয়ত যা নয়, তাই-ই বানিয়ে পরিহাস ক’রে বা মজা করবার জন্য বন্ধুস্থানীয় অবিনাশবাবুর কাছে ঐ কথা বলেছিলেন। কারণ, নজরুল পরিহাসপ্রিয় ও অত্যন্ত রঙ্গপ্রিয় মানুষ ছিলেন। আর বন্ধুমহলে ত খুবই মজা করতেন।

নজরুল ব্যঙ্গ ও শ্লেষ-সহ যেমন প্রচুর হাসির গান লিখেছেন, তেমিনি বন্ধুমহলে এবং অন্যত্রও হাসি, ঠাট্টা, ইয়ার্কি ও মজা করা নিয়ে মশগুল থাকতেন। দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি —

১. এস. এম. এহিয়া তাঁর ‘হাসির রাজা নজরুল’ প্রবন্ধে লিখেছেন — ‘ছেলেবেলা থেকেই তিনি (নজরুল) রঙ্গপ্রিয়, নির্দোষ হাস্য-কৌতুকে তখনকার দিনে তাঁর জুড়ি ছিল না।... উপভোগ্য কৌতুক রস সৃষ্টিতে নজরুল ছিলেন দক্ষ কারিগর।’

২. একবার এক হিন্দু ভদ্রমহিলা নজরুলের কাছে গান শিখতে যান। ভদ্রমহিলা গেলে, নজরুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — এতদিন কার কাছে গান শিখতেন?

উত্তরে মহিলা বললেন — গিরিজাবাবুর কাছে।

তখনকার দিনে গিরিজাশংকর চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। মহিলাটি ঐ গিরিজাবাবুর কাছেই গান শিখতেন।

নজরুল ভদ্রমহিলার মুখে গিরিজা শুনেই হেসে বললেন — তা গীর্জা থেকে একেবারে মসজিদে চলে এলেন?

মহিলা নজরুলের পরিহাস শুনে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলেন।

৩. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘ধূমকেতুর কবি নজরুল’ প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন — ধূমকেতুর আড্ডায় সারাদিন লোকের পর লোক আসে, কেউ পরিচিত হতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য স্থাপন করতে, কেউ-বা প্রেরণা লাভ করতে। মাটির ভাঁড়ে ক’রে চা সবার জন্য তৈরি। একদিন এল সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি কিশোর। ফরিদপুর থেকে এসেছে, নাম হুমায়ুন কবির।

অনেক প্রশ্নের মধ্যে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল — আচ্ছা, আপনারা মাটির ভাঁড়ে ক’রে চা খান কেন?

জবাবে বললাম — একটু বসে থাকলে নিজেই এর জবাব পেয়ে যাবে। একটু পরেই নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার) এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল আধ-ভর্তি চায়ের ভাঁড় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল — দে গরুর গা ধুইয়ে!

চা ছিট্‌কে পড়ল মেঝেতে মাদুরে বইয়ে-কাগজে — সবার গায়ে। ভাঁড়টা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কবিরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বুঝতে পারছ এখানে ভাঁড়ে চা খাওয়ার রেওয়াজ কেন? গরুর গা ধুইয়ে দিতে প্রথম তিন দিনেই দু ডজন কাপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কাপ ভাঙা মিঠে আওয়াজ শোনবার জন্য নিত্যি কাপ কেনা হবে, এমন কাপ্তেন আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, বিজলী-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার 'ধূমকেতু'র আড্ডায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল এইরূপ মজা করেছিলেন। তাই যে-নজরুল নলিনীবাবুকে নিয়ে এরূপ মজা করতেন, সেই নজরুল বিজলীর অন্যতম কর্ণধার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যাকে নজরুল অবিদা, অবিদা বলতেন — তাঁর কাছেও ত মজা ক'রে — জোড়াসাঁকোয় গিয়ে ঐ গুরুজী, গুরুজী ইত্যাদি বলার কাহিনীটি বানিয়ে বলতে পারেন!

নলিনীকান্ত সরকারও তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বইয়ে লিখেছেন — 'সাহিত্যে নজরুল, সঙ্গীতে নজরুল, সভাসমিতিতে নজরুল, আড্ডা মজলিসে নজরুল... রঙ্গরসে নজরুল... কোথায় কিসে নাই নজরুল।'

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরোনো কথা' প্রবন্ধে নজরুলের জোড়াসাঁকোয় গিয়ে গুরুজী গুরুজী ইত্যাদি বলার যে কাহিনী লিখেছেন, তাতে তিনি পরিষ্কার বলেন নি যে, এইটাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ। অবিনাশবাবু না বললেও, অনেকেই কিন্তু অবিনাশবাবুর লেখা প'ড়ে এইটাকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ বলেছেন।

১৩৯৪ সালের শারদীয় সংখ্যা 'অনুবাদ' পত্রিকায় তিতাশ চৌধুরী, তাঁর 'নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে লিখেছেন —

'নজরুল-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহম্মদ বলেছেন,... রবীন্দ্র-ভক্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর। রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-জীবনী' প'ড়ে জানা যায় যে, অবিনাশ ভট্টাচার্য কথিত 'রবীন্দ্র-নজরুল' সাক্ষাৎকারের সন-তারিখ মিলিয়ে দেখলে বিশ্বাস্য নয়। এ নিয়ে শাহাবুদ্দীন আহম্মদ প্রশ্ন তুলেছেন,... তাহলে অবিনাশ ভট্টাচার্যের কথা কি মিথ্যা? অবিনাশ ভট্টাচার্যের কথায় আছে যে, নজরুলের মুখে বিদ্রোহী শোনার পর রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। শাহাবুদ্দীন আহম্মদ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎকারের আরও আলামত হিসেবে নজরুলের অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি কবিতাটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেন এইভাবে : ধ্যান শান্ত মৌন তব কাব্যরবিলোকে / সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম/রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা কক্ষচ্যুত উপগ্রহ। বক্ষেধরি তুমি/ ললাটে চুমিয়া মোর দানিলে আশিস। —এবং তারপর বলেন, বুকে জড়িয়ে ললাট চুম্বন করে আশীর্বাদ দানের ঘটনা ঠিক, মিথ্যা ছিল না। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, অবিনাশ ভট্টাচার্যের কথা মিথ্যা বা ঘটনাটি মিথ্যা ছিল একথা কে বললেন শাহাবুদ্দীন আহম্মদকে? ডঃ রফিকুল ইসলাম? তিনি তো সন-তারিখের কথা বলেছেন মাত্র। আসলে সন-তারিখ মিলিয়ে দেখলে অর্থাৎ একটু সত্যসন্ধ ও সময় ও কাল সচেতন হ'লে ডঃ রফিকুল ইসলামের যুক্তি ও তর্ক নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহম্মদের মেধা ও মননকে এমনভাবে উস্কে দিত না। কেননা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২২ সালের[১] অক্টোবরে, শাহাবুদ্দীন আহম্মদের মতে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের পর নয়।... নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎকারের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে এই ত গেল, 'বিজলী' গোষ্ঠীর নজরুলের পরিচিত বা তাঁর 'অবিদা' অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। এ প্রসঙ্গে নজরুলের আর এক পরিচিত কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আবার লিখেছেন—

'জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন তেমন বড় লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়িতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বল্‌তো, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সাহসই হবে না তোর এমন ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকাল বেলা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন—কিন্তু তাঁকে জানতেন ব'লে কবি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না। শুনেছি, অনেক কথাবার্তার পর কবি নাকি বলেছিলেন—নজরুল তুমি নাকি তরোয়াল দিয়ে আজকাল দাড়ি কামাচ্ছ—ক্ষুরই ও কার্যের জন্যে প্রস্তুত—একথা পূর্বাচার্যগণ বলে গেছেন।'

সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর এই লেখা প্রকাশিত হয়, বুদ্ধদেব বসুর ১৩৫১ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায়। পূর্বোক্ত বিশ্বনাথ দে তাঁর 'নজরুল স্মৃতি'

● ১. তিতাশ চৌধুরীর লেখায় এখানে তারিখটা ছাপার ভুলে ১৯২২ হয়েছে, হবে ১৯২১।

গ্রন্থে এই লেখার দাড়ি কামানোর কথাটা বাদ দিয়ে বাকিটা উদ্ধৃত করেছেন। তবে কোথা থেকে নিয়েছেন, তা তিনি তাঁর অন্যান্য সংকলিত লেখাগুলির মত এটার ক্ষেত্রেও তা বলেন নি।

তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কামানোর যে কাহিনী আমরা পড়ি, সে তো অনেক পরের ঘটনা। নজরুল একদিন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে, তখন রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে একথা বলেছিলেন। তাও সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু যা লিখেছেন, তা নয়। একটু অন্য এবং সঙ্গত কথাই। এ নিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থে লিখেছেন —

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলেছিলেন — শুনছি, তুমি নাকি মন জোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছ। বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচবার জন্য।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেরে, এ নিয়ে পরে এক কবিতায় লিখেছিলেন। সেই কবিতা হ'ল —

মনে পড়ে ? বলেছিলে হেসে একদিন
তরবারি দিয়ে তুমি চাঁচিতেছে দাড়ি
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি।
দ্রষ্টা তুমি দেখেছিলে আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণ ঘন রূপে।
অভিনন্দনের মদ্ চন্দনিত মধু
হইয়াছে হে সুন্দর তব আশীর্বাদে।

সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন — দে গরুর গা ধুইয়ে — রব তুলতে তুলতে নজরুল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

এখানেও প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে আছেন কিনা, কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করেই নজরুল সিধা দুতলায় ঐ রব করতে করতে চলে গেলেন ?

আর একটা কথা — সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে চিনতেন বলেই তিনি এতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না। এই 'চিনতেন' কি রকম ? আগে কি নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ? না নজরুল সম্বন্ধে ঐরূপ কোন কথা কারও কাছে শুনেছিলেন ?

অনেক লোকের যেমন — ধরনা কেন, মনে কর, তোমার গিয়ে প্রভৃতি মুদ্রাদোষ আছে, এবং কথায় কথায় এরূপ কথা বলে থাকে, নজরুলও তেমনি মুদ্রাদোষই হোক্ বা মুদ্রাগুণই হোক্ বা কথার মাত্রাই হোক্ মাঝে মাঝে কথার মধ্যে বা

অমনিই আবেগ বশে কখন কখন 'দে গরুর গা ধুইয়ে' ব'লে উঠতেন। তাঁর 'দে গরুর গা ধুইয়ে' নামে একটা কবিতাও আছে।

পশ্চিমবঙ্গের এবং বাংলা দেশের বহু লেখক নজরুলের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের অনেকে কেউ অবিনাশবাবুর লেখা এই 'গুরুজী' 'গুরুজী' কাহিনী, কেউ সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর লেখা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কাহিনী, আবার কেউ বা এই দুটা কাহিনীই তাঁদের বইয়ে দিয়েছেন। যেমন, এই পশ্চিমবঙ্গের একজন নজরুল- গবেষক সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর বইয়ে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর কাহিনীটি দিয়েছেন, অপরজন বাঁধন সেনগুপ্ত তাঁর বইয়ে ঐ দুটা কাহিনীই দিয়েছেন।

অথচ এঁরা কেউই 'দে গরুর গা ধুইয়ে' ব'লে রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুলের ঐভাবে যাওয়া সত্য কিনা এ নিয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। ফলে ঐ কাহিনীকে এঁরা একরূপ সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

'গুরুজী' 'গুরুজী' কাহিনীর উচ্চারিত বাক্যগুলি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কথাও বাঁধনবাবু সত্য কিনা প্রশ্ন না তোলায় সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

যাই হোক্, তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার যতগুলো পরিচয় পাওয়া গেছে, সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, নজরুল বিনীত এবং ভদ্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথও সস্নেহে তাঁকে গ্রহণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামনে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের উপস্থিতি সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর একটা লেখা মনে পড়ছে। সেই কাহিনীটা এখানে বলছি—

নাট্য মন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। শিশিরবাবু ঐ অভিনয় দেখবার জন্য একদিন রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। শিশিরবাবু সেদিন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কয়েকজন সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ জানান।

নাটক দেখে চ'লে যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ শিশিরবাবুকে বলেছিলেন—কাল সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এস, নাটক নিয়ে কথা হবে। —ঐ সঙ্গে সেখানে উপস্থিত কল্লোলের কয়েকজনকেও তিনি ঐ কথা বলেছিলেন।

পরের দিন সকালে কল্লোলের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। সেদিনের কথা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—

'শিশিরকুমার আমাদের কাছে বিরাট বনস্পতি—অনেক উচ্চস্থ। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে ক্ষণকালের জন্য হ'লেও শিশিরকুমার ও আমাদের মধ্যে যেন কোনই প্রভেদ ছিল না। দেবতাত্মা নগাধিরাজের কাছে বৃক্ষ তৃণ সবই সমান।'

প্রায় এই রকমেরই একটা কথা পাই আর একজনের একটা লেখায়। তিনি দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন—একজন প্রেস ফটোগ্রাফারের

বড় সাধ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের একসঙ্গে একটা ফটো তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় আছেন জেনে ঐ ফটোগ্রাফার তাঁর মনের কথা নজরুলকে জানান। নজরুল তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন — যাও, কোথায় হিমালয় আর কোথায় আমি!

দেখা যাচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর নজরুলের কী শ্রদ্ধা! এ হেন নজরুল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে — আপনাকে হত্যা করবো, হত্যা করবো ব'লে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প'ড়ে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন, একি বিশ্বাস্য?

নজরুল কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম গিয়েছিলেন, এ নিয়ে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু এবং 'বিজলী' গোষ্ঠীর অবিনাশবাবুর বক্তব্যের মধ্যে যেমন মিল বা ঐক্য নেই, ঠিক এমনি শরৎচন্দ্রের একবার বহরমপুর যাওয়া নিয়ে এই সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু এবং বিজলী-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের বর্ণনার মধ্যেও অমিল দেখি। এ সম্পর্কে এখানে একটু বিস্তৃতই আলোচনা করছি —

নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বইয়ে লিখেছেন — শরৎচন্দ্র একবার তাঁর কি একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহরমপুরে গেলে, তাঁর অনুমতি নিয়েই স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেন। সভার সময় স্থির হয় বিকাল ৫টায়। শরৎচন্দ্র আহারের পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এস্টেটের ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে যান। দেখা হ'লে গঙ্গার ধারে বসে যতীনবাবুর সঙ্গে গল্প করেন। সভার সময় চলে যাচ্ছে — যতীনবাবু বার বার একথা বলা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্র নানা অছিলায় আরও অনেক দেরি করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্বর্ধনা সভায় আর এলেনই না।' — নলিনীবাবু লিখেছেন, এ কথা তিনি যতীন সেনগুপ্তর মুখে শুনেছেন।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে গিয়ে কবি যতীন সেনগুপ্তকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের আবার একটা লেখা (শরৎ-স্মরণিকায়) চোখে পড়ায় দেখছি, তাতে তিনি লিখেছেন — শরৎচন্দ্র এবং যতীনবাবুর সঙ্গে সেদিন সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুও গিয়েছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন — শরৎচন্দ্র সেবার বহরমপুর গিয়েছিলেন, সেখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি হাওয়ার আমন্ত্রণ নিয়ে। আর সেই সভাতেই শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। চারটে নাগাদ তো তোমাদের সভা, ব'লে শরৎচন্দ্র দুপুরের পর মুর্শিদাবাদে সিরাজের কবর দেখতে গিয়েছিলেন। কবর দেখে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসে সৈদাবাদ রাজবাড়ির ফটকে যখন ফেরেন, তখন সাড়ে

ছটা বেজেছে। —না, খুব অন্যায় হয়ে গেল, ব'লে শরৎচন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন, কারও দিকে ফিরেও তাকালেন না।

এতে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু ও যতীনবাবু বিষণ্ণ মনে সভায় খবরটা দেবার জন্য যখন আসছেন, এমন সময় পথে শুনলেন, সভায় হাজার খানেক লোক হয়েছিল, মহিলারাও এসেছিলেন। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী জোড় হাত করে সভাস্থ সকলকে বলেন, বুঝতে পারছি না, শরৎবাবু কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন? লোক পাঠিয়েছি, সে এখনো ফিরে আসেনি। আপনারা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন। —এরপর নমঃ নমঃ করে সভা শেষ হয়েছে।

সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন— পরের দিন সকালে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম, তিনি রাত্রির গাড়ীতে কলকাতা ফিরে গেছেন।

মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে ১৯৭৬ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহ ধরে মহা আড়ম্বরে শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ঐ উৎসবে ১৫ই তারিখের বিকালের সভায় বর্তমান লেখক অর্থাৎ আমি ছিলাম সভাপতি, আর বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ত্রিদিব চৌধুরী এম. পি. ছিলেন প্রধান অতিথি।

সেখানে ১৪ই তারিখে বিকালে হিন্দী সভায়ও ত্রিদিববাবু এবং আমি উভয়েই বক্তা ছিলাম। সেদিন ত্রিদিববাবু তাঁর বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছিলেন— শরৎচন্দ্রকে আমি কাছে থেকে দেখেছি। তিনি একবার আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে একটি সভায় গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দু একটা কথাও হয়েছিল।

সভার পরে ত্রিদিববাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শরৎচন্দ্র কবে, কিসের সভায় বহরমপুরে গিয়েছিলেন?

আমার কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

আমি তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ি। সেটা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। খুব সম্ভব তখন আগস্ট মাস। সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার বহরমপুরে যান। তখনকার দিনে কলকাতা থেকে রাত্রি ১০টা ১১টা নাগাদ একটা 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার' ছাড়ত। ঐ ট্রেনটা পরের দিন ঠিক সকালেই বহরমপুরে গিয়ে পৌঁছত।

শরৎচন্দ্র ঐ রাত্রের ট্রেনে চেপে সকালেই বহরমপুরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি বহরমপুর শহরে গিয়ে উত্তর প্রান্তে সৈদাবাদে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'সৈদাবাদ হাউসে' উঠেছিলেন। ঐ বাড়িতে এখন মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি হয়েছে।

এই সৈদাবাদেই মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর মামীমা মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নামে তখন ছিল 'স্বর্ণময়ী ক্লাব'। শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন, ঐ স্বর্ণময়ী ক্লাবের এক বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে 'স্বর্ণময়ী ক্লাবে' আসবেন শুনে আমরাও আমাদের 'যুব সমিতি'র এক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। সকালে ছিল স্বর্ণময়ী ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, ঐ সভার পর বিকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি আমাদের যুব সমিতির সভায় আসবেন বলে কথা দেন।

আমাদের যুব সমিতি ছিল বহরমপুরের গ্রান্ট হলে। গ্রান্ট হল শহরের মাঝখানে। এর নিকটেই ছেলেদের ও মেয়েদের কলেজ এবং ছাত্রাবাস ইত্যাদি।

সকালে স্বর্ণময়ী ক্লাবের সভার পর স্নানাহার সেরে শরৎচন্দ্র নৌকায় করে সৈদাবাদ থেকে মাইল চার দূরে মুর্শিদাবাদ শহরে গঙ্গার পশ্চিম পারে এলাহিগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার সমাধি দেখতে যান। তারপর সেখান থেকে নৌকায় বহরমপুর ঘাটে আসেন। যুব সমিতির সভ্যরা ঘাট থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে গ্রান্ট হলে তাঁকে নিয়ে আসেন।

পরে এ সম্পর্কে বহরমপুরের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ সেনের পৌত্র শোভেন্দ্রমোহন সেনকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শোভেন্দ্রবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি বললেন — শরৎচন্দ্র সেবার সৈদাবাদ রাজবাড়ির নিকটেই এক পৃথক বাড়িতে অবস্থিত মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল, নিঃস্ব ও দুঃস্থদের সাহায্য করা এবং আর্ত ও রোগীর সেবা করা।

শোভেন্দ্রবাবুর কথা ছাড়াও শরৎচন্দ্র স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গেলে, তখন সমিতির সভ্যবৃন্দ তাঁকে যে মানপত্র দিয়েছিলেন, সেটিও অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। এই মানপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে — শরৎচন্দ্র বহরমপুরে ব্যক্তিগত কাজে বা কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে যান নি, গিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক উৎসবেই।

ত্রিদিববাবুর কথা থেকে জানা যাচ্ছে, কলেজে বা যেখানেই শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়ে থাক, তিনি সিরাজদ্দৌলার কবর দেখে দেরি করে শেষ পর্যন্ত সম্বর্ধনা সভায় যান নি। তবে রাত্রে ত্রিদিববাবুদের যুব সমিতির সভায় গিয়েছিলেন।

ত্রিদিববাবু অনেকদিন পরে স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে সেদিন বলেছিলেন — ১৯২৯ সালের সম্ভবতঃ আগস্ট মাসের ঘটনা। স্বর্ণময়ী সমিতির প্রদত্ত মানপত্রে তারিখ আছে — ১০ই ভাদ্র ১৩৩৫। অর্থাৎ ত্রিদিববাবুর বলা ১৯২৯ সালের আগস্ট নয়, ১৯২৮ সালের আগস্ট।

সৈদাবাদের স্বর্ণময়ী সমিতির প্রদত্ত এই মানপত্রের মত কোন সঠিক প্রমাণ বা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হাতে থাকলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম

সাক্ষাৎ কবে কোথায় কিভাবে হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যেত। তবে এবার যে ঘটনাটা বলছি, এটা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য বলেই মনে করছি—

১৩৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কথা সাহিত্য' পত্রিকা নজরুল সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এক সময়কার একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর ছোটভাই, পরে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমের অধিবাসী নিশিকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর 'আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল' প্রবন্ধে লিখেছেন—'সবে শিশু বিভাগ থেকে নতুন গুরুপল্লীতে দাদা সুধাকান্তর বাড়িতে এসেছি। বৌদি তাঁর শিশুপুত্র সৌম্যকান্তকে নিয়ে পিত্রালয় শিবহাটি গ্রাম থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। এই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে দাদা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বলছেন শুনলাম—হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুধাকান্তের ওপরই ভার পড়ল তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার, অতিথি ভবনে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার ও কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার। গুরুপল্লীর এই বাড়িটিতেই সুধাকান্তের বন্ধুরা আসতেন এবং তাঁদের আড্ডাটি বেশ জমে উঠত। সুধাকান্ত ছিলেন মজলিসী মানুষ। নানা কথাবার্তার মধ্যে নজরুলের কবিতা নিয়েও আলোচনা হ'ত। দাদার সঙ্গে নজরুলের সবিশেষ পরিচয় আছে—এ খবরটিও আমার কাছে বিশেষ আনন্দের হয়ে উঠল।

'মোসালেম ভারত' পত্রিকা দাদার কাছে আসতে লাগল, তখন নজরুলের কবিতা নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকার প্রথম দিকেই দেখতে পেতাম ও সাগ্রহে পাঠ করতাম। শুনলাম পূর্বোল্লিখিত কলাভবনের দোতালায় সান্ধ্য-আসর বসবে, সচকিত মন নিয়ে দাদার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলাম, দেখলাম, কবিগুরু বসে আছেন মাঝখানে। ...সকলেই সমবেত হয়েছেন। কবিগুরুর পাশে দু'জন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁদের একজনকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে বললেন, ঐ দেখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা নজরুলের সান্নিধ্যেই বসলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ পরা কাঁচাপাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন।

তিনি কবিগুরুকে বলছিলেন—ট্রেনে আসতে আসতে কাজী সাহেব আপনার গীতাঞ্জলির সব ক'টা গান আমাকে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিগুরু বললেন,—তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলির গান সবতো আমারই মনে থাকে না।

কাজী সাহেব বললেন, গুরুদেব আমি আপনার কণ্ঠে একটি গান আর একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই। গুরুদেব বললেন, সে কি? আমি যে তোমার গান আবৃত্তি শোনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও। আমাকে আবার রাত্রিবেলা লেখায় ব্যাপৃত থাকতে হবে। নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি করলেন—'আগমনী' কবিতাটি।'

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমের অধিবাসী নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর বর্ণিত এই কাহিনীটিকে সত্য বলে মনে করি। নিশিকান্তবাবু তাঁর এই লেখায় বলেছেন — কাঁচাপাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন — তিনি ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক (পরে ডক্টর) মহম্মদ শহীদুল্লা। তিনি প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

নিশিকান্তবাবু লিখেছেন, তাঁর দাদা সুধাকান্তর বাড়িতে বন্ধুদের আড্ডায় নজরুলের কবিতা নিয়েও আলোচনা হ'ত। সুধাকান্তবাবু নিজে কবিতা লিখতেন ব'লে, 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকায় নজরুলের কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হতেন। তিনি 'সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর ঐ কবিতাটি ১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুধাকান্তবাবুর সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি —

সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি
শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুগ্ধ কর বিশ্বজনে দাও গো নূতন প্রাণ।
দমকে চলা হাওয়ার মত ছন্দ তোমার চলে
মাড়িয়ে দিয়ে সকল বাধা ক্ষিপ্র চরণ তলে।
যৌবনেরি জীবন দিয়ে বৃদ্ধে তরুণ কর,
রাগ-রসেরি পরশ দিয়ে চিত্ত অরুণ কর।
'সে-কাল' বুড়োর অধর সীমায় মদের পাত্র ধরি
তোমরা তারে 'একাল' কর, মাতাও নতুন করি।
সমাজ বিশেষ নয় তোমাদের জীবন নদীর বাধা,
তোমার বীণায় বিশ্ব গানের সকল সুরই সাধা।
তোমার গানের সুরের তাতে অসাড় মারণ জাগে,
যে রসিকের হৃদয় ভরে প্রণয় অনুরাগে।
বন্ধুজনের প্রীতির মালা তোমায় দিলাম আজ,
পরবে কি গো এ ? নাই যে এতে পান্না চূনীর কাজ।
মহব্বতের ফুলের শ্বাস এই মালাতে আছে,
খোস্-বু তাহার পৌঁছে দিনু ছন্দে তোমার কাছে।

'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের কবিতা প'ড়ে, তাঁর প্রতি গুণ-মুগ্ধ হয়েছিলেন।

নজরুলের এই প্রথম শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার একটা কারণও ঘটেছিল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'চলমান জীবন' ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর উপস্থিতিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নজরুলের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হয়েছিল — সত্যেন্দ্রনাথ নজরুলকে বললেন — তুমি ভাই নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।

নজরুল বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করলেন — গুরুদেব আমার কোন লেখা পড়েছেন নাকি ?

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন — সত্য বলতে কি, গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন — কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমি পড়েছি কি না? তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান এনেছ তুমি।

পবিত্রবাবুর এই লেখা থেকে মনে হয়, নজরুল সত্যেন দত্তর মুখে ঐ কথা শুনেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবেন স্থির করেন। এই সময় তাঁর একটা সুযোগও ঘটে গেল। তাঁর পরিচিত ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাচ্ছেন জানতে পেরে নজরুল তাঁর সঙ্গী হন।

নজরুল যে তখন অধ্যাপক শহীদুল্লার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিযেছিলেন, তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও।

১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পূজাব ছুটির সময়কার কথায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী — ৩য় খণ্ড গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১০) লিখেছেন —

'পূজাবকাশের পূর্বদিন (১৩২৮ আশ্বিন) সন্ধ্যায় নাট্যঘরে অভিনয় [ঋণশোধ নাটকের] হইয়াছিল। সে ঘর এখন নাই।...

পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও গেলেন না; তিনি আছেন উত্তরায়ণের প্রান্তর মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে। পূজাবকাশ বলিয়া অতিথি সমাগম কিছু কম নয়। বাঁকুড়া হইতে আসেন অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন, ...মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছেন কাজিন্স দম্পতি...। এছাড়া আসেন অধ্যাপক শহীদুল্লা ও তরুণ কবি নজরুল ইসলাম।'

এ বছর দুর্গাপূজার সপ্তমী পূজার দিন ছিল ২২শে আশ্বিন বা ৮ই অক্টোবর। অতএব নজরুল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন।

১৩৯৪ সালের শারদীয় 'অনুবাদ' পত্রিকায় তিতাশ চৌধুরী 'নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশিকান্তবাবুর কথাকেই সমর্থন করেছেন। তবে তিনি তাঁর প্রবন্ধে যে লিখেছেন — 'রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের একখানি

খড়ের ঘরে — যার আধুনিক রূপ কোণার্ক — অবস্থান করছিলেন।... রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের কোণার্কে।'

এটা ঠিক নয়; কারণ আমরা সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর লেখায় পাচ্ছি — রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের দু'তলায়।

এবার আর একটা কথা —

নিশিকান্তবাবু তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন — রবীন্দ্রনাথ বলায় 'নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি করলেন —'আগমনী' কবিতাটি।

'আগমনী' নামে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা আছে। মনে হয়, হয়ত, নজরুল তাঁর নিজের তখনকার লেখা 'আগমনী' কবিতাটিই আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন।

এই কবিতাটি প্রসঙ্গে সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন — হিন্দু দেবদেবী লইয়া লিখিত কবিতা 'এ কি রণবাজা বাজে ঝন ঝন' সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' (আষাঢ় ১৩২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।' — পৃঃ ৫৬

সুশীলবাবুর লেখায় 'এ কি রণবাজা বাজে ঝন ঝন' হ'ল 'আগমনী' কবিতার প্রথম পংক্তি। তাও এখানে সুশীলবাবুর লেখায় ভুলে 'বাজে ঝন ঝন' হয়েছে। হবে 'বাজে ঘন ঘন'।

সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিতমানস' এবং 'নজরুল ইসলাম' দুটা বইয়েই লিখেছেন — ১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় নজরুলের 'আগমনী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এটাও ভুল। 'আগমনী' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায়। সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন সহ-সম্পাদক। সম্পাদক ছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

এখন একটা কথা মনে হচ্ছে — নজরুল আশ্বিন মাসে শান্তিনিকেতনে যাবার সময় সম্ভবতঃ সদ্য প্রকাশিত এক খণ্ড আশ্বিন সংখ্যা বা পূজা সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং ঐ পত্রিকা দেখেই 'আগমনী' কবিতাটি আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন।

আর একটা কথা — রবীন্দ্রনাথ নজরুলের আবৃত্তি শুনে কি বলেছিলেন — সেকথা কেউ লিখে না যাওয়ায় তা আজ আর জানা গেল না। নিশ্চয় উচ্চ প্রশংসাই করেছিলেন।

নজরুল তাঁর এই 'আগমনী' কবিতাটি পরে তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যায় অর্থাৎ পূজা সংখ্যায় (৯ই আশ্বিন, ১৩২৯) প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ

১৯২৫ সালের শেষদিকে 'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ' দল গঠিত হ'লে এই দলের মুখপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। লাঙল-এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। নজরুল ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক, সম্পাদক ছিলেন তাঁর সৈনিক জীবনের পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'লাঙল'-এর ঠিকানা ছিল ৩৭নং হ্যারিসন রোড (বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড)।

এই 'লাঙল' পত্রিকার জন্য সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি আশীর্বাণী এনে দিয়েছিলেন। অবশ্য নজরুলও সেদিন সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গেও সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থে এই কথাগুলি লিখেছেন — রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'লাঙল'-এর জন্য আশীর্বাদ জোগাড় করবার ভার পড়ল আমার উপর। একদিন সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন।

সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দুজনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তাঁর স্বরচিত গান শোনাতে বল্লেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলো 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' আর 'শিকলপরা ছল'। রবীন্দ্রনাথ খুসী হলেন গান শুনে।

সৌম্যেন্দ্রবাবু লিখেছেন, দু-চারটি কথার পর রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বল্লেন — শুনছি তুমি নাকি মন যোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছ, বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন, দাড়ি চাঁচবার জন্য!

এ কথা বইয়ে আগে বলেছি।

'লাঙল'-এর জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া আশীর্বাণীটি ছিল এই —

জাগো জাগো বলরাম
ধরো তব মরু-ভাঙা হল
প্রাণ দাও শক্তি দাও
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।

এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে এই আশীর্বাণীটি ছাপা হয়েছে এইভাবে—

ধর হাল বলরাম, আন তব মরু-ভাঙা হল
বল দাও, ফল দাও, স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর কবিতায় লেখা টুকরো টুকরো বাণী আশীর্বাণী ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বভারতী থেকে যে 'স্ফুলিঙ্গ' বই প্রকাশিত হয়, তাতে এই কবিতাটি প্রভাতবাবুর বই থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে প্রভাতবাবুর লেখা দু পংক্তির এই কবিতাকে চার পংক্তির করে ছাপা হয়েছে।

'লাঙল' প্রথম প্রকাশের কয়েক সংখ্যা পর থেকে কাগজের প্রচ্ছদে এই কবিতাটি ছাপা থাকতো।

এই সাপ্তাহিক 'লাঙল' চলেছিল ১৯২৬ এর ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত।

পরে এই 'লাঙল'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'গণবাণী'। 'গণবাণী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এর ১২ই আগস্ট।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'যাত্রী' বইয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—'বিশ্ব সাহিত্যের কথা দূরে থাক, নিজের দেশের সাহিত্যের খবরও সে (নজরুল) খুব কমই রাখত। একবার প্রায় জোর করে বললেই হয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে কালিদাসের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথের এই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, নজরুল সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিক বার রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন।

নজরুল ছেলেবেলায় এত রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন যে, কেউ তাঁর সামনে রবীন্দ্র-বিরুদ্ধ কথা বললে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। এ নিয়ে তখন তিনি একজনকে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন।

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে লিখেছেন—'মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন।'

এ থেকে মনে হয়, নজরুলের সামনেই মণিবাবু ঐ কথা রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন।

১৩২৯ সালের ২৮শে আষাঢ় (১২ই জুলাই ১৯২২) সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রদ্ধা-সভা হয়েছিল। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সভায় প্রচুর লোক সমবেত হয়েছিল। সভায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ এবং প্রমথ চৌধুরীর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর নজরুল সত্যেন্দ্রনাথের উপর লেখা

তাঁর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এই কবিতাটি কলকাতার 'হরফ' থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' ৩য় খণ্ড গ্রন্থে আছে। সেখানে কবিতাটির মাথায় শিরোনাম আছে, সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ—আর কবিতার শেষে পাদটীকায় লেখা হয়েছে—কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩২৯।

কিন্তু সভা হয়েছিল শ্রাবণে নয় আষাঢ়ে।

যাই হোক্, সেদিন এই সভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছিল এবং উভয়ের মধ্যে দু-একটা কথাও হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

কলকাতায় আর্য সমাজীদের রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে উপলক্ষ্য ক'রে ১৯২৬ এর ২রা এপ্রিল (১৩৩২ সালের ১৯শে চৈত্র) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গায় ব্যথিত হয়ে নজরুল তখন সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন।

নজরুল এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত কোরাস সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি রচনা করেন এবং একদিন এ গান তিনি রবীন্দ্রনাথকে শোনান-ও।

নজরুল লিখেছেন—

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখ, যে ল্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ল্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় যে, এ ন্যাজ গজাল কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়?

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার' নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' গানের একটি পংক্তি। নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখায় বলেছেন—একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে এ গান শুনিয়ে ছিলেন।

কবে কোথায় নজরুল রবীন্দ্রনাথকে এ গান শুনিয়েছিলেন, তার ইতিহাস জানা না গেলেও, এটা দেখা গেল যে, তাঁদের উভয়ের মধ্যে তখন দেখা হয়েছিল, এবং হয়ত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই নজরুল তাঁর আরও গানের সঙ্গে এই গানটি গেয়েও রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে, 'বাংলার কথা'য় রবীন্দ্রনাথের একটি অভিভাষণের বিকৃত পাঠ প'ড়ে নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' রচনায় ভুল করে রবীন্দ্রনাথের উপর কয়েকটা অভিযোগ এনেছিলেন। অবশ্য অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনীতভাবেই।

বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় এই ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা হ'লে তখন নজরুল প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে ছিলেন এবং নজরুল নিজের ভুল স্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন।

পরে বইয়ে এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলেছি।

১৯৩১ সালে দার্জিলিং শহরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের একবার দেখা ও কথাবার্তা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি—

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

'দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ হাবিলদাব-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা ছিল—'কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুলঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে।' ...কবি হাসতে হাসতে বললেন, 'এইরকম আর একটি জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে।' আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।'

...রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন।...

পূর্বের 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী'র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া সাহিত্যিক মোরগের উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া।... আমরা 'জয়ন্তী-সংখ্যা' প্রকাশ করিয়া ব্যজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। ...মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা-পরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।'

'শনিবারের চিঠি'র মলাটে থাক্‌ত মোরগের ছবি। আর 'সজনে' শব্দের সঙ্গে সজনীকান্তের নামেরও অনেকটা আক্ষরিক মিল থাকায় সজনীকান্ত ভেবেছিলেন, কবি তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। সত্যই কবি সজনীকান্তকে লক্ষ্য করে, ঠিক ঐ কথাগুলো বলেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন, সজনীকান্ত বা তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র দল কবিকে যেভাবে আক্রমণ করতেন, তাতে করে কবির পক্ষে ঐ কথা বলা হয়তো একেবারে অসম্ভবও ছিল না।

কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধটা দেখেছি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কবিতা প'ড়ে, সেই কবিতাগুলির প্রশংসা করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—'নিঃসহায় মোরগ ও মেড়ার লাঞ্ছনায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হ'লে অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ হ'ত, আমাদের সেই দুয়ো দেবার দুর্দাম নেশাকে আমরা সকল উপলক্ষেই ভোঁতা করবার চেষ্টা করি ব'লে বাংলাদেশে কোনো বড়ো কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ পেল না। নিজের দেশের মানুষকে এবং কাজকে নিজের হাতে খর্ব করবার শখ আমাদের কিছুতেই মিটতে চায় না। সেই শখ বিছুটির মতো গজিয়ে ওঠে, আমাদের রাষ্ট্রসভায়, ধর্ম-সম্প্রদায়ে, সাময়িক পত্রে, জনসেবাকর্মে, ছাত্রদের হস্‌টেলে। আমাদের সাহিত্যবিচারে মনন বস্তুর দৈন্য যথেষ্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই দুয়ো দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভালো বলতে চাই, তাকে ভালো বলেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুক্ত করে নেই এবং আর একজনকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তবে আমাদের শখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষে আর একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে উৎসাহ, সে সাহিত্য নয়, সে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনো দিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।'

সজনীকান্তর 'আত্মস্মৃতি' প'ড়ে জানা যায়, দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, নজরুল স্বয়ং সেই সাক্ষাতের কথা ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

এই আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকা কোথাও পাইনি। তাই কারও কারও লেখায় ঐ রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের কথা কিছু কিছু পেলেও, সমস্তটা পেলাম না। এই যে কারও কারও লেখার কথা বললাম, এঁদের কয়েকজনের লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি—

১৩৬০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকায় অখিল নিয়োগী তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে গেছি। সেখানে গিয়ে কবি নজরুল ইসলাম আর নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা।

এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল—রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন দার্জিলিং-এ আমাদের খুবই কাছে।

নজরুল প্রস্তাব করলেন, একদিন দলবেঁধে কবির কাছে যাওয়া যাক।

যে কথা সেই কাজ।

আমরা রওনা হলাম কবি-সকাশে।

নজরুলকে নিজের পাশে পেয়ে কবি আজ ভারী খুসী।

কথার ওপর কথা চল্‌ল্‌—বাঙলা সাহিত্যের গল্পের কথা, নাটকের কথা, গানের কথা, বিদেশী কবিদের কথা। আমরা শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি।

নজরুল সেই সময় মন্মথ রায়ের কয়েকটি নাটকে গান রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই নাটকগুলি কেমন জমেছিল কবি জিজ্ঞাসুনেত্রে সে প্রশ্ন করলেন এবং নানারকম গানের সুর নিয়ে বেশ কিছুটা রসিকতা করতেও ছাড়লেন না।

বিদেশী কবি দানেনৎশিও সম্পর্কেও খানিকক্ষণ আলোচনা চল্‌ল।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ভুঁইয়া ইকবাল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' পুস্তকে নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন—

'নজরুল-জীবনীকার আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ একদিন আলাপ-প্রসঙ্গে নজরুলকে তুলনা করেন ইতালীয় কবি দানুসজিওর সঙ্গে। নজরুল ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীমন্মথ রায়, অবনী রায়, শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীপ্রবোধ গুহ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ স্নেহের সুরে তাঁকে বলেন, 'ইতালীতে এক দ্বীপের মাঝখানে বাস করেন দানুসজিও, তিনি তোমার চাইতেও পাগল।'

আবদুল কাদির এই লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী' থেকে।

১৩৯৪ সালের শারদীয় 'অনুবাদ' পত্রিকায় (ত্রয়োদশ বর্ষ) তিতাশ চৌধুরী তাঁর 'নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'নজরুল দার্জিলিঙে 'বর্ষবাণী' পত্রিকার সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সবান্ধবে।[১] সেই সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়।' (১৯৩১ সালের ২০শে জুন)

এখানে দেখছি, দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের সময় নিয়ে এই লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আমার মনে হয়, তিতাশ চৌধুরী বর্ণিত সময়টাই ঠিক।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সাল বা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাইয়ে দেশে ছিলেন না, বিদেশভ্রমণে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-য়েই ঐ সময় দার্জিলিং গিয়েছিলেন। আবদুল আজীজ আল্‌-আমন তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল রচনাসম্ভার' ২য় খণ্ড গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'কয়েকটি অটোগ্রাফ' অধ্যায়ে নজরুলের সাতটি ছোটো কবিতা ছেপেছেন।

১. অখিল নিয়োগী তাঁর 'আপন ভোলা নজরুল' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'বাংলা দেশের (তখনকার অখণ্ড বাংলা দেশের) এক প্রকাশক কাজীদাকে দার্জিলিং পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে নিরিবিলি বসে হজরত মহম্মদের জীবনী কবিতাতে রচনা করতে হবে।'

সেখানে মুদ্রিত ৫ ও ৬ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়—নজরুল কবিতা লিখে কবিতার শেষে স্থান, তারিখ দিয়েছেন যথাক্রমে—দার্জিলিঙ ১৬.৬.১৯৩১ ও দার্জিলিঙ ২০শে জুন ১৯৩১ (ইং), (পৃ. ২৬৪)।

দেখা যাচ্ছে, ১৯৩১ সালে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের সময় সেখানে মন্মথ রায়ও উপস্থিত ছিলেন। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকা কোথাও না পাওয়ায়, সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে যা লিখেছেন এবং অখিল নিয়োগী, আর আবদুল কাদির যা যা বলেছেন, সে সব ঠিক কিনা, এবং এঁদের বলা কথা ছাড়া রবীন্দ্র-নজরুলের মধ্যে আরও কী কী কথা হয়েছিল, জানবার জন্য একদিন মন্মথদার (মন্মথবাবু আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন, আমি তাঁকে দাদা বলতাম) বাড়িতে গিয়েছিলাম।

আমি মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা দাদা, দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়, আপনিও তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন?—এই ব'লে, সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে সজনে ফুল আর মুরগী-র কথা নিয়ে যা লিখেছেন, তা বললাম—ব'লে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ কি ঐ ধরণের কথা বলেছিলেন?

শুনে মন্মথদা বললেন—'সেদিন কী সব কথা হয়েছিল আজ আর কিছু মনে নেই। তবে একটা কথা এখনও পরিষ্কার আমার মনে আছে। সেটা বলছি—'দার্জিলিঙে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে বললেন—আপনি এসেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্য অমর হ'ল। অমর হয়ে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তা বলা যায় না। কার সাহিত্য অমর হবে, আর কার সাহিত্য হবে না। তবে আমার মনে হয়, আমার কিছু গান থেকে যাবে।

আমার সঙ্গে কাগজ কলম ছিল। আমি মন্মথদার মুখে ঐ কথা শুনে বললাম—কথাগুলো আবার বলুন, আমি লিখে নিই।

তিনি আবার বললেন। আমি লিখে নিলাম।

পরে বললেন, কাগজটা দাও। আমি সই করে দিই।

আমি কাগজটা দিলে তিনি লেখাটা প'ড়ে, তাতে নিজের নাম সই করে দিলেন।

এরপর মন্মথদা বললেন—আর একটা কথা হয়েছিল মনে পড়ছে। আমার নাটকের গান নিয়ে তিনি আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। আমি গান লিখতে পারি না। আমার চার-পাঁচটা নাটকে নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন। আমার 'কারাগার' (১৯৩০) নাটকেও নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ঐ সাক্ষাতের কয়েক মাস আগে মনমোহন থিয়েটারে আমার 'কারাগার' নাটক মাত্র ১৮ রজনী অভিনয়ের পরই তখনকার ব্রিটিশ শাসকের রাজরোষে

অভিনয় নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[১] এতে নজরুলের গানগুলি আরও জনপ্রিয় হয়ে জাতির মর্মবাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি নিয়েই ক'টা কথা বলেছিলেন।

১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার নজরুলেব সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছিল। বাঁধন সেনগুপ্ত তাঁর বইয়ে সে কথা বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন। সেই লেখাটাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

১৯৩৬ সালে কলকাতার দেবদত্ত ফিল্মস রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা'র চলচ্চিত্র রূপ দান করেছিলেন। ছবির পরিচালক ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক নরেশ মিত্র। 'গোরা' ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সেকালেও চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা বা গান ব্যবহার করতে গেলে 'বিশ্বভারতী'র সঙ্গীত বিভাগীয় বোর্ড থেকে রেকর্ড বা ফিল্মের গানগুলির জন্য অনুমতি নিতে হ'ত। কবির স্নেহধন্য ব'লে সঙ্গীত পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের অনুমতি না নিয়েই 'গোরা' ছবিতে কবিগুরুর গান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ভেবেছিলেন তিনি নিজে যেখানে সঙ্গীত পরিচালক সেখানে রবীন্দ্রনাথ, নিশ্চয়ই অনুমতি না নেওয়ায় কোনো আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পাওয়ার দু-এক দিন আগে অর্থাৎ 'ট্রেড শো'য়ের দিন বিশ্বভারতীর পর্যবেক্ষক এসে কবির গানগুলির ত্রুটি ধরে ছবির মুক্তি বন্ধ করে দিলেন। প্রযোজকের তখন অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নজরুল সঙ্গে সঙ্গে একটি মোটর গাড়িতে 'গোরা' ফিল্মের প্রিন্ট আর একটি ছোট প্রোজেকশন মেসিন সহ দেবদত্ত ফিল্মসের মালিক ও কাজীর সহকারী মানু গাঙ্গুলীকে নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। গুরুদেব হঠাৎ নজরুলকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত। আনন্দিত হয়ে নজরুলকে কুশলাদি জেনে নেবার পর কবি বলেছিলেন, এসেছোই যখন কয়েকদিন তাহলে আমার কাছে থেকে যাও। নজরুল আশ্বস্ত হয়ে উত্তর দিলেন—সে তো আমার সৌভাগ্য—কিন্তু এখন যে এক ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এরপর কাজী সাহেব 'গোরা' ছবির গানের অনুমতি না নেওয়া-জনিত সঙ্কটের কথা রবীন্দ্রনাথের সামনে খোলাখুলি স্বীকার করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বকবিকে অবহিত করলেন। সেই সঙ্গে উঠল বিশ্বভারতী বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়ার কথা। গুরুদেব সব কিছু শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—কী কাণ্ড বলত! তুমি শিখিয়েছ আমার গান, আর ওরা কোন্ আক্কেলে তার দোষ ধরে? তোমার চেয়েও আমার গান কি তারা বেশি বুঝবে! আমার গানের মর্যাদা কি ওরা বেশি দিতে পারবে?

১. এই নাটকে কংস চরিত্রটিকে দেখানো হয়েছিল, যেন তখনকার ভারতের অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক।

নজরুল সঙ্গে সঙ্গে বললেন — কিন্তু লিখিত অনুমতি না পেলে সামনের ঘোষিত তারিখে ছবিটার মুক্তি দেওয়া যাবে না। আপনি দয়া ক'রে আজ এক সময় ছবিটা দেখুন — আমি প্রোজেক্টর ও ফিল্ম সঙ্গে করে এনেছি। তারপর অনুমতি পত্রে একটা সই দিয়ে দিন।

বিশ্বকবি বললেন, 'ছবি দেখাতে চাও সকলকেই দেখাও, সবাই আনন্দ পাবে। আপাতত দাও কিসে সই করতে হবে।' — এই বলে নজরুলের হাত থেকেই লিখে রাখা অনুমতি পত্র নিয়ে তাতে সই ও তারিখ দিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনেই ছবিখানি যথারীতি মুক্তি পেল।

নজরুল তাঁর 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' কবিতার প্রথমেই লিখেছেন —

চরণারবিন্দে লহ পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।

এই পংক্তিগুলি প'ড়ে মনে হয়, ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের ৮০ তম জন্মদিন উপলক্ষে নজরুল এই কবিতাটি লিখেছিলেন এবং সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রনাথের ৮০ তম জন্মোৎসবের সভায় উপস্থিতও ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাতের পর আরও যে কয়েকটি সাক্ষাতের বা আলাপ-আলোচনার কথা জানতে পেরেছি, তা এখানে বললাম। মনে হয়, এ সব ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের আরও হয়ত কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের এই সব সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর অসাক্ষাতে নজরুল তাঁর কাজে ও লেখায় কিরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়েছিলেন, এখানে তার মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি —

নজরুল তখন বালক মাত্র। সেই সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রভক্ত। ঐ সময় একদিন ফুটবল খেলার মাঠে তাঁর এক বন্ধু রবীন্দ্র-বিরুদ্ধ কথা বললে, নজরুল রাগে খেলার মাঠের গোল পোস্ট-এর বাঁশ দিয়ে ঐ বন্ধুকে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন।

নজরুল তাঁর জীবনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি' এই গানটি খুব গাইতেন। পরে নিজে গান রচনা করে তাতে সুর দিয়ে বন্ধুদের শোনাতেন।

নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে (১৯২২ খ্রীঃ) ৭নং প্রতাপ চাটুয্যে লেন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নজরুল নিজেই এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন। তিনি বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বাংলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।

রবীন্দ্রনাথের 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' একটি গান আছে। নজরুল স্কুল জীবনে স্কুলের শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলালের কাছে এই গান প্রথম শিখেছিলেন। তিনি তখন প্রায়ই এই গানটি গাইতেন।

নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্য-গ্রন্থের নাম করণে রবীন্দ্রনাথের ঐ গানের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

নজরুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন গ্রন্থ হ'ল — সঞ্চিতা। ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর কলকাতার 'বর্মণ পাবলিশিং হাউস' প্রথম এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

পরে এই বছরেই কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে 'সঞ্চিতা'র আর একটি বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নজরুল এই সংস্করণ 'সঞ্চিতা' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ ক'রে উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন —

উৎসর্গ

বিশ্বকবিসম্রাট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু

নজরুল রবীন্দ্রনাথকে এ বই উৎসর্গ ক'রে, এই বই নিয়ে নিজে রবীন্দ্রনাথকে এক খণ্ড দিয়ে এসেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না।

'বহুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এলো আমার মনে' — রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত বর্ষা-সংগীতটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ১৩২৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'অলকা' মাসিক পত্রিকায়। ১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকার 'কষ্টি পাথর' অংশে (পৃঃ ৬৭০) গানটি 'অলকা' থেকে নিয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রবাসী প্রকাশিত হ'ত মাসের একেবারে প্রথমেই। ঐ দেখে নজরুলও তাঁর 'ধূমকেতু'র ৮ম সংখ্যায় (২৬শে ভাদ্র ১৩২৯) 'মিষ্টি-মুখ' হেডিং এবং 'বর্ষা-মঙ্গল' সাব-হেডিং দিয়ে এই গানটি প্রকাশ করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনী—৩য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন — এই গান ১৩২৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটা ভুল।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে নজরুল রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলেন। সেই কবিতাগুলি হ'ল — কিশোর রবি, তীর্থ পথিক এবং অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি।

'কিশোর কবি' কবিতার আরম্ভটা হ'ল—

হে চির-কিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন্ রসলোক হ'তে
আনন্দ-বেণু হাতে ল'য়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে?
কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি ক'রে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুর পৃথিবীর ঘরে ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণে বেরোবেন শুধু এই সংবাদটা ধূমকেতুর ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় (শুক্রবার, ২৯শে ভাদ্র ১৩২৯, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২২) কী সুন্দরভাবে নজরুল প্রকাশ করেছিলেন, তা এখানে দেখাচ্ছি—

'বাউল কবির টহল

আসা যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছে চেয়ে
কাহার পথ পানে।'-

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আগামী সোমবার শারদোৎসব শেষ করে[১] ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করার জন্য বার হবেন। প্রথমেই বোম্বে যাবেন, তারপর সেখান থেকে মাদ্রাজ ও সিংহলে যাবেন।

এবার গুরুদেবের শরৎ দেখছি 'ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি'। আমাদের প্রাণের মূর্তবাণী আজ সঞ্চারিণী দীপশিখার মত বিশ্বের দরবারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যাদের মুখে এই শিখার আলো পড়বে, তারা হেসে উঠবে। বাঙলার শরৎ এবার কবির গান-হারা হয়ে করুণ কিরণে কাঁদবে। তবু ছাড়তেই হবে। সবাই যে এঁকে ডাকছে,

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা
মম চোখের সুমুখে ক্ষণেক থাম না।'

১. রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব নাটকের তখন অভিনয় হয়েছিল কলকাতায় আলফ্রেড থিয়েটারে ও ম্যাডান থিয়েটারে ১৩২৯-এর ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন (১৯২২-এর ১৭ই, ১৮ই সেপ্টেম্বর) তারিখে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

কারাগারে নজরুল : রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' ছিল, সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকা। ধূমকেতু প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের ২৬শে শ্রাবণ (১১.৮.১৯২২ খ্রীঃ) তারিখে। এই পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠার আয়তন ছিল লম্বায় ১৫ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ১০ ইঞ্চি। আট পাতার এই কাগজের প্রতি সংখ্যার দাম ছিল, এক আনা। নজরুল এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন।

'ধূমকেতু' প্রকাশের আগে এই কাগজের জন্য একটি আশীর্বাণী চেয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে টেলিগ্রাম করলে রবীন্দ্রনাথ তখন এই কবিতাটি লিখে নজরুলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক্ মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ   শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩২৯

ধূমকেতুর প্রতি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় এই কবিতাটি ব্লক করে সম্পাদকীয় স্তম্ভের ঠিক উপরেই ছাপা হ'ত।

ধূমকেতু পত্রিকায় নজরুলের দেশাত্মবোধক বেশ জ্বালাময়ী কবিতা এবং প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত।

এই ধূমকেতুর ১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যায় বা পূজা সংখ্যায়—১৩২৯ সালের ৯ই আশ্বিন (২৬.১১.১৯২২ খ্রী:) মঙ্গলবারের সংখ্যায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতার একেবারে প্রথমাংশে কয়েক পংক্তি ছিল এই—

আর কতকাল থাক্‌বি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব্‌-শিশুদের মার্‌ছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূভারত আজ কসাইখানা — আস্‌বি কখন সর্বনাশী?
দেবসেনা আজ টান্‌ছে খানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে
রণাঙ্গণে নাম্‌বে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধ'রে?

আর কবিতার মাঝে ছিল—

তুই একা আয় পাগলী বেটি তাথৈ তাথৈ নৃত্য ক'রে
রক্ত তৃষ্ণায় 'ময়্‌ ভূখা হুঁ'-র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধ'রে।

* * * * *

এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি
দুচোখ পূরে জল আসে মা, আর কতকাল কর্‌বি দেরী?

কবিতাটি দেবী দুর্গার আবাহন হিসাবে লেখা হ'লেও এতে তৎকালীন পরাধীন ভারতের শাসক ইংরাজের নানা অত্যাচারের কাহিনী স্পষ্টই বর্ণিত হয়েছে।

নজরুলের বিশেষ পরিচিত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কবি নজরুল' গ্রন্থে ভুল ক'রে লিখেছেন, ধূমকেতুর দেওয়ালী সংখ্যায় নজরুলের 'ময় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধ প্রকাশের পর তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

প্রাণতোষবাবুর এই লেখা পড়েই হয়ত পিনাকী ভাদুড়ী তাঁর 'উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'নজরুল' অধ্যায়ে লিখেছেন — ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমন' প্রকাশিত হ'লে 'পুলিশ কাল বিলম্ব না করে 'ধূমকেতু' অফিসে হানা দিয়ে ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে। নজরুল তখন কলকাতার বাইরে। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারা যায় নি। 'ধূমকেতু'র দেওয়ালী সংখ্যায় একটি কড়া সম্পাদকীয় বেরোল — 'ময়্‌ ভুখা হুঁ'। এবার নজরুল তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হলেন।'

সেবার কালীপূজা ছিল ২রা কার্তিক। দেওয়ালী সংখ্যা হিসাবে 'ধূমকেতু' বেরোয় ৩রা কার্তিক মঙ্গলবারে। এটা ছিল ধূমকেতুর ১৫শ সংখ্যা। ধূমকেতুতে নজরুলের 'ময়্‌ ভুখা হুঁ' প্রবন্ধ বেরোয় এর কয়েক সংখ্যা আগে ৯ম সংখ্যায়।

ধূমকেতুতে এই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হ'লে, ভারতের ইংরাজ সরকার নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার হওয়ার আগেই নজরুল কুমিল্লায় চলে যান। পুলিশ

২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ক'রে ট্রেনে ক'রে ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যায় পুলিশ তাঁকে কলকাতায় আনে।

কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইন্‌হো-র এজলাসে তাঁর বিচার আরম্ভ হয়। এই সময় সুইন্‌হো নজরুলের কিছু বক্তব্য থাকলে, তা বলতে পারেন, বলেছিলেন। এতে নজরুল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে তাঁর একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলেন।

কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী মলিন মুখোপাধ্যায় কোনরূপ পারিশ্রমিক না নিয়ে নজরুলের পক্ষ সমর্থনে আদালতে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু কিছুই হ'ল না। সুইন্‌হো বিচারে ১৯২৩-এর ১৬ই জানুয়ারি নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' ধূমকেতুর ১ম বর্ষের ৩১শ সংখ্যায় (১৩ই মাঘ ১৩২৯ বা ২৭শে জানুয়ারি ১৯২৩ সংখ্যায়) ছাপা হয়েছিল।

রাজবন্দীর জবানবন্দী তখন পুস্তিকা আকারে ছেপে হাজার হাজার কপি বিক্রি করাও হয়েছিল। দাম ছিল হাতে এক আনা, ডাকে দেড় আনা বা ছ পয়সা।

'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে নজরুল যা বলেছিলেন, তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি—

আমার উপর অভিযোগ আমি রাজবিদ্রোহী, তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।...

রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত রাজবেতন ভোগী রাজকর্মচারী।

আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধ'রে সত্য—জাগ্রত ভগবান।...

রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ। আমার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহীন সমুদ্র।...

প্রেসিডেন্সী জেল, কলিকাতা
৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩

বিচারাধীন বন্দী হিসাবে নজরুলকে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়েছিল। তারপর তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আনা হয় ১৭ই জানুয়ারি। পরে নিয়ে যাওয়া হ'ল হুগলী জেলে।

প্রথম দিকে হুগলী জেলে নজরুলকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময় দেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন

থেমে আসায় ইংরাজ সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে তাদের নীতি পরিবর্তন করে। তখন তারা স্থির করে, কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কয়েদীকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে রাখা হবে। বাকিদের সাধারণ কয়েদী হিসাবে রাখা হবে।

নজরুলকে সাধারণ বন্দী হিসাবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হুগলী জেলে নজরুলকে সাধারণ কয়েদীদের পোষাকই পরতে হ'ত।

নজরুল যখন হুগলী জেলে বন্দী সেই সময় ১৩২৯ সালের ১০ই ফাল্গুন (১৯২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী) তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। বইয়ে উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

উৎসর্গ

শ্রীমান্ কবি নজরুল ইসলাম

স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন, ১৩২৯

রবীন্দ্রানাথ তাঁর এই উৎসর্গীকৃত 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলের বন্ধুস্থানীয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে হুগলী জেলে নজরুলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্রবাবু লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন,—

'জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে খুসী হতাম। কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, আমার হয়ে তুমিই বইখানা ওকে দিও।...

কে যেন দু কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তাকে ব'লো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না ব'লে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর ব'লো কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা যোগাবার কবিও তো চাই।

জেলের ইন্টারভিউ—নিয়ম মাফিক গরাদের ব্যবধানে আমি প্যাকেট খুলে গুরুদেবের উৎসর্গপত্র দেখাতেই নজরুল লাফ দিয়ে পড়ল...।'

নজরুল হুগলী জেলে থাকার সময় 'শিকল পরা ছল', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'সুপার (জেলের) বন্দনা' প্রভৃতি কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। 'শিকল পরার

ছল’ গানে তিনি সুর দিয়ে জেলের মধ্যে অনেকে মিলে গাইতেন। গানটি হ’ল—

(এই) শিকল-পরা ছল মোদের, এ শিকল-পরা ছল,
(এই) শিকল প’রেই শিকল তোদের করবো রে বিকল!
(তোমার) বন্ধী কারায় আসা মোদের বন্দী হ’তে নয়,
(ওরে) ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়!
(এই) বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
(এই) শিকল-বাঁধা পা নয়, এ শিকল-ভাঙা কল।

* * * * *

স্বদেশভক্ত বিপ্লবী নজরুলের এই জেলের বিরুদ্ধে আর একটি তেজদৃপ্ত রচনা হ’ল—

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল্ কর্ যে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী
ওরে ও তরুণ ঈষাণ
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী’র প্রাচীর ভেদি।—ইত্যাদি

নজরুল যখন হুগলী জেলে বন্দী তখন ঐ জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ছিলেন আর্স্টন নামে এক ইংরাজ। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিদর্য় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—‘তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে’। নজরুল আর্স্টনকে নিয়ে এই গানটির প্যারডি ক’রে একটি গান রচনা করেছিলেন। সেই গানের নাম দিয়েছিলেন ‘সুপার (জেলের) বন্দনা’। গানটি ছিল এই—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে।
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আ-কাঁড়া চালের অন্ন লবণ

করেছো আমার রসনা লোভন,
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপ্‌সী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা স-গুষ্টি
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠি
তুমি ধন্য ধন্য হে।

নজরুল সদলে জেলের মধ্যে এই গান গেয়ে আর্স্টনকে অভ্যর্থনা করতেন। আর্স্টন গান শুনে ক্ষেপে যেতেন।

নজরুল তাঁর 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে এই 'সুপার (জেলের) বন্দনা' গানটিকে অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন।

গানটি বইয়ে দিয়ে নজরুল এই গানের শেষে পাদটীকায় লিখেছেন — হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ ক'রে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।

নজরুলের একটা 'ভাঙার গান' বইয়ে এই কবিতার 'ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠি' পংক্তিটা দেখলাম, ছাপার ভুলে হয়েছে — লও-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠি।

আর্স্টনের গায়ের রঙ্‌টা ছিল সাধারণ ইংরাজের চেয়ে বেশি রকমের ফর্সা। খাওয়ার ওল-এর উপরটা চাঁচলে ছুল্‌লে যে রকম রঙ্‌ দেখা যায়, নজরুল এই পংক্তিতে ওল-ছোলা ব'লে সাহেবের গায়ের সেই রঙ্‌ বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কবি নজরুল' গ্রন্থে এই কবিতাটি ছেপেছেন। সেখানে শেষ স্তবকটা ছাপার ভুলে হয়েছে —

ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে।

প্রাণতোষবাবু তাঁর 'কাজী নজরুল' দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থে এই ভুলটা সংশোধন করেছেন।

হুগলী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে নজরুল ১৯২৩ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখ থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। নজরুল অনশন ধর্মঘট শুরু করলে তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন।

নজরুল অনশন ধর্মঘট চালিযে যেতে থাকলে দেশের অনেকের মত রবীন্দ্রনাথও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তখন শিলং-য়ে। রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করবার জন্য অনুরোধ ক'রে নজরুলকে তারবার্তা পাঠিয়ে ছিলেন, এই বলে—

GIVE UP HUNGER STRIKE,

OUR LITERATURE CLAIMS YOU.

কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের এই তারবার্তা নজরুলকে না দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছিল। তখন এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু

রথী, নজরুল ইসলামকে Presidency Jail -এর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম Give up hunger strike our literature claims you. জেল থেকে memo এসেছে The addressee not found, অর্থাৎ ওরা আমার message ওকে দিতে চায় না—কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুল দেশবাসীর অনুরোধে ৩৯ দিন অনশনের পর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা—

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করবার জন্য অনুরোধ ক'রে পত্র দিতে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলং থেকে নজরুলকে চিঠি না লিখে তাঁর ঐ পত্র প্রেরকদের লিখেছিলেন—

'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা, তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যু ঘটে তা হ'লেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমাময় হয়ে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথ এরূপ কথা লিখেছিলেন ব'লে বিশ্বাস হয় না। কারণ, যে রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করবার জন্য নজরুলকে 'তার' করছেন, তিনি এ কথা লিখেছিলেন?

পবিত্রবাবু স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক কথা লেখেন নি। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—তিনি নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধু হয়েও নজরুলের 'ধূমকেতু' সম্বন্ধে লিখেছেন—ধূমকেতু ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা, আর এর দাম ছিল এক পয়সা। —অথচ ধূমকেতু ছিল অর্ধ সাপ্তাহিক এবং পত্রিকার দাম ছিল এক আনা।

পবিত্রবাবু আরও লিখেছেন—নজরুলের জেল হওয়ার পর দু সপ্তাহ কাগজ

বন্ধ থাকে। তারপর ধীরেন সেনগুপ্তর সম্পাদনায় পাক্ষিক হিসাবে দুটা সংখ্যা বেরিয়ে ধূমকেতু বন্ধ হয়ে যায়।

নজরুলের জেল হওয়ায় অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতুর মাত্র একটা সংখ্যা বন্ধ ছিল। ধূমকেতু কখন পাক্ষিক পত্রিকা হয়নি। আর নজরুলের পর পত্রিকার সারথী বা সম্পাদক হয়েছিলেন, অমরেশ কাঞ্জিলাল। সাহিত্য পরিষদে ১ম বর্ষের ধূমকেতু আছে, ১ম বর্ষের ৩২ সংখ্যা (১৩ই মাঘ, ১৩২৯, ২৭ জানুয়ারি ১৯৩২) পর্যন্ত। দেখলে সমস্ত জানা যাবে।

ভূঁইয়া ইকবাল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' বইয়ে লিখেছেন — রাজবন্দীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে নজরুল ১৯২৩-এর মে মাসে অনশন শুরু করেন।

ভূঁইয়া ইকবালের লেখা এই তারিখটা ভুল। কারণ, নজরুল অনশন শুরু করেছিলেন ১৫ই এপ্রিল এবং ৩৯ দিন অনশন ক'রে ১৯২৩-এর ২৩শে মে অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।

নজরুল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের একটি চিঠি

রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা নজরুলের অনেকগুলি কবিতা পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের একটি মাত্র পুরা চিঠিই পাওয়া গেছে। সেই চিঠিটি লেখার ইতিহাস হ'ল—

নজরুল এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে ১৯৩৪ সালে 'নাগরিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'ত কলকাতার ১সি মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট থেকে। এই পত্রিকার ২য় বর্ষের অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের পূজা সংখ্যার জন্য নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি লেখা চেয়ে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। নজরুলের লেখা চিঠিতে তারিখ ছিল—২৮শে আগস্ট ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

গুরুদেব! বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি। আমার ওপর হয়ত প্রসন্ন কাব্য-লক্ষ্মী হিজ মাস্টার্স-ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছেন বহু দিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছি। আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সত্ত্বেও আমি আপনার দূরে দূরেই থেকেছি। তবু জানি আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক ও কবি বন্ধু 'নাগরিক' পরিচালনা করছেন। গতবার পূজায় আপনার কিরণস্পর্শে 'নাগরিক' আলোকিত হয়ে উঠেছিল, এবারও আমরা সেই সাহসে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি। আপনার যে-কোনো লেখা পেলেই ধন্য হব। ভাদ্রের শেষেই পূজা সংখ্যা 'নাগরিক' প্রকাশিত হবে, তার আগেই আপনার লেখনীপ্রসাদ আমরা পাব আশা করি।

আপনার স্বাস্থ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করলাম না। —ইতি

প্রণত

নজরুল ইসলাম

নজরুলের এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৫-এর ১লা সেপ্টেম্বর নজরুলের কলকাতার ঠিকানায়, এই চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন।

ঔ

কল্যাণীয়েষু,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুব খুসী হ'ল। কিছু দাবী করেছ—তোমার দাবী অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই, পঁচাত্তরে পড়তে তোমার অনেক দেরি আছে। সেইজন্য আমার শীর্ণশক্তি ও জীর্ণদেহের 'পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্ত্রবলে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হোতো। কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক দূরে চলে গেছে। এখন দেহে মনে মানব সমাজকে চলতে হয় সায়েন্সের সীমানা বাঁচিয়ে।

অনেকদিন থেকে আমার আয়ুর ক্ষেত্রে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, কিছুদিন থেকে তার উপরও দেহযন্ত্রের বিকলতা দেখা দিয়েছে। এখন মূলধন ভেঙে দেহযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে, যা ব্যয় হচ্ছে তা আর পূরণ হবার নেই।

তোমাদের বয়সে লেখা সম্বন্ধে প্রায় দাতাকর্ণ ছিলুম, ছোটোবড়ো সকলকে অন্ততঃ মুষ্ঠি ভিক্ষাও দিয়েছি। কলম এখন কৃপণ, স্বভাবদোষে নয়, অভাববশতঃ। ছোটো বড়ো নানা আয়তনের কাগজের পত্রপুট নিয়ে নানা অর্থী আমার অঙ্গনে এসে ভিড় করে। প্রায় সকলকে ফেরাতে হলো। আমার অনাবৃষ্টির কুয়োর শেষতলায় অল্প যেটুকু জল জমেছিল, সেটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কৃপণের অখ্যাতি শেষ বয়সে স্বীকার করে নিয়ে রিক্ত দানপাত্র হাতে নিয়ে বিদায় নেব। যারা ফিরে যাবে, তারা দুয়ো দিয়ে যাবে, কিন্তু বৈতরণীর মাঝ দরিয়ায় সে ধ্বনি কানে উঠবে না।

আজকাল দেখতে পাই ছোটো ছোটো বিস্তর কাগজের অকস্মাৎ উদ্গম হচ্ছে—ফুল ফসলের চেয়ে তাদের কাঁটার প্রাধান্যই বেশি। আমি সেকেলে লোক, বয়সও হয়েছে। সাহিত্যে পরস্পর খোঁচাখুঁচির প্রাদুর্ভাব কেবল দুঃখকর নয়, আমার কাছে লজ্জাজনক বোধ হয়।

এই জন্যে এখানকার ক্ষণসাহিত্যের কাঁচা রাস্তায় যেখানে সেখানে পা বাড়াতে আমার ভয় লাগে। সাবধানে বাছাই করে চলবার সময় নেই, নজরও ক্ষীণ হয়েছে, এইজন্যে এই সকল গলিপথ এড়িয়ে চলাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক, করুণা দাবী করতে পারে। অকিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাকে লজ্জা দিয়ো না। এই নতুন যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্যতীর্থে যাত্রা করবে, পাথেয় তাদের নিজের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায় — কখনো যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো খুসী হব। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে। ইতি —

১৫ ভাদ্র ১৩৪২

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুল এই চিঠি পেয়ে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন এবং 'তীর্থ পথিক' নামক একটি কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর দেন। সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি —

তীর্থপথিক

হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী, আমারে করিও ক্ষমা!
পর্বত-সম শত দোষ-ত্রুটি ও-চরণে হ'ল জমা।
জানি জানি তা'র ক্ষমা নাই, দেব, তবু কেন মনে জাগে
তুমি মহর্ষি করিয়াছ ক্ষমা আমি চাহিবার আগে।
কোটি পূজারিণী পূজারী ভক্ত তোমার প্রসাদ যাচে,
গুঞ্জরি' ফেরে কত সে মধুপ তোমার পায়ের কাছে।
তাহারা কি চাহে তাহারাই জানে, আমি এই যাচিয়াছি;
তোমার আলোক-কণা পেয়ে আমি খদ্যোৎ হয়ে বাঁচি।
হে ঠাকুর, আমি মুক্তি চাহিনি, ভক্তি চেয়েছি আমি;
তুমি জান তব ভক্তের ব্যথা, তুমি অন্তর্যামী।
অফুরান তাই আব্দার মোর, অনন্ত আশা সাধ,
যত নাহি পাই, হৃদয়-সাগর তত হয় উন্মাদ।
পাই নাহি পাই, খেদ নাহি তায়, তবু শুধু যাই চেয়ে',
শিশু অকারণ পুলকে যেমন মা'র নাম যায় গেয়ে'।
জানি না, কেন যে বহুজন জানে তুমি মোর চির-চেনা,
ফিরাবে যেখানে আর সব জনে, সেথা মোরে ফিরাবে না।
অন্তরের এ কথা মোর, দেব, মোর অভিমান নাহি
রিক্ত-পাত্র ফিরি যদি আমি তোমার প্রসাদ চাহি'।
চাহিতে পেরেছি, নিকটে এসেছি, এই আনন্দ মোর —
তীর্থ-পথিক আসিতে পেরেছি তব মন্দির-দোর।

যে বাণী শোনালে, হে লীলা-রসিক, মোরে বঞ্চনা-ছলে,
তাই পড়ি, আর নিবারিতে নারি অবাধ্য আঁখি-জলে!
আমি জানি, তুমি অজর, অমর, তুমি অনন্ত-প্রাণ;
মহাকালও নাহি জানে, কবি, তব আয়ুর সে পরিমাণ।
তুমি নন্দন-কল্পতরু যে, তুমি অক্ষয় বট;
বিশ্ব জুড়ায়ে রয়েছে তোমার শত কীর্তির জট।
তোমার শাখায় বেঁধেছে কুলায় নভোচারী কত পাখী,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় জুড়াই ক্লান্ত আঁখি।
বিজ্ঞান বলে, বলুক, রবির কমিয়া আসিছে আয়ু;
রবি র'বে, র'বে যতদিন এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু।
মহাশূন্যের বক্ষ জুড়িয়া বিরাজে যে ভাস্কর,
তা'র আছে ক্ষয়, এত প্রত্যয় করিবে কোন্ সে নর?
চন্দ্র-ও আছে, আছে অসংখ্য তারকা রাতের তরে
তবু দিবসের রবি বিনা মহাশূন্য সে নাহি ভরে।
তুমি রবি, তুমি বহু ঊর্ধ্বের, তোমার সে কাছাকাছি
যাবে কোন্ জন? তোমার কিরণ-প্রসাদ পাইয়া বাঁচি।
তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,—
তব গুণ-গানে ভাষা-সুর, যেন সব হয়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।
কাব্যলোকের বাণী-বিতানের আমি কেহ নহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে তবু কেন এ আশিস্-হার?
প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে!

(নাগরিক। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৪২)

এখন, রবীন্দ্রনাথকে লেখা নজরুলের ২৮শে আগস্ট ১৯৩৫ তারিখের চিঠিটি নিয়ে কিছু বলছি—

এই চিঠিতে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের ভয়ে' ব'লে যে কথাটা আছে, তার প্রসঙ্গ হ'ল—

গ্রামোফোন কোম্পানীর 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসে'র রেকর্ডের উপর ছাপান একটা ছবি থাকে এ রকম—গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে গান বাজানো হচ্ছে, তার

সামনে বসে একটা কুকুর তার মনিবের গলার গান শুনছে। নজরুল এখানে তাঁর এই চিঠিতে রেকর্ডে এই ছবির কথাই বলেছেন।

নজরুল এই সময় 'কলগীতি' নামে কলকাতায় ১৬নং বিবেকানন্দ রোডে একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান করেছিলেন। দোকানটা বছর দুই চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে দোকান নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। নজরুলের তখন অসহায় অবস্থা। পরে নজরুল এই গ্রামোফোন কোম্পানীতেই সংগীত রচয়িতা এবং সংগীতের শিক্ষকের কাজ পেয়েছিলেন।

নজরুল তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন — আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না — রবীন্দ্রনাথের লেখার সাধনায় নজরুল যে তেমন কোন বিঘ্ন ঘটান নি, এ কথা সত্য। এজন্য তিনি প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য।

আমরা জানি, কত লোক, কত সামান্য কারণে বা কত অকারণে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময় নষ্ট ক'রে সে সমস্ত চিঠির উত্তর দিয়েছেন।

আরও জানি, কত লেখক তাঁদের কত কত লেখা বই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়েছেন — প'ড়ে অভিমত দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রে ঐ সব বই প'ড়ে অভিমত দিয়েছেন।

এও জানি, কেউ কেউ জোর ক'রে বা জুলুম ক'রেও এইরূপ অভিমত আদায় করেছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি —

রবীন্দ্রনাথের সময়ে বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ নামে একজন কবি ও গল্প লেখক ছিলেন। তিনি ফিট্‌জেরাল্ডের ইংরাজি অবলম্বনে ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ অনুবাদ করেছিলেন। 'পঞ্চপত্র' নামে গদ্য ও পদ্যে লেখা তাঁর একটা গল্পের বইও ছিল। এ ছাড়া তাঁর লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধও ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা এই বিজয়বাবুর একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি —

শ্রীচরণেষু,

আপনি আমার রোবাইয়াৎ ও পঞ্চপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই কেন? আপনার বিশ্বে আমার ঠাঁই না থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ বই দু-টুকরোও কি বিষ্ণুলোকের বাইরের?

যাহা হউক সত্বর অভিমত চাই। যেহেতু আমার প্রকাশক উহা আশা করিতেছেন। (প্রকাশক চান রোবাইয়াতের, আমি নিজে চাই পঞ্চপত্র সম্বন্ধে)। East ও West মিলাইতে চাহিলে 'ছোটলোক' ও 'বড়লোক' মিলাইতে চাওয়া চলে না বুঝি? ...ইতি

প্রণত

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথা বলেছেন। মনে হয়, তারই প্রসঙ্গ এনে, বিজয়বাবু এখানে East ও West এর মিলন এবং হয়ত 'ছোটলোক' ও 'বড়লোক' মিলনের কথা তুলেছেন।

যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথ তখন বিজয়বাবুর চিঠির উত্তরে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিটি এই—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

রুবাইয়াতের অনুবাদ নিপুণ ছন্দে ও সরস ভাষায় রচিত, তাহা পড়িয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। পঞ্চপত্র পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মনে পড়ে না বলিয়া পাই নাই এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। আজকাল পড়িবার সময় পাই না। অনেক সময় বইয়ের মোড়ক খোলা ওঠে না। East ও West মিলাইবার উৎসাহে ছোটদের অবজ্ঞা করি না বলিয়াই যে এমন ঘটে—আপনার এ বিদ্রূপের আমি অধিকারী নহি। যে কাজকে আমি গুরুতর বলিয়া জানি, আপনি তাহাকে ব্যঙ্গের বিষয় মনে করেন বলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া আপনার গ্রন্থের অভিমত লিখিব এরূপ আশা করিবেন না। আপনার রুবাইয়াতের অনুবাদ বন্ধ রাখিয়া আমার কাজে ত কখনো আপনি পাঁচ মিনিটও সময় দেন নাই। সেজন্য আমি আপনাকে দোষী করিনা, আপনিও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি ২৬ ফাল্গুন ১৩২৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে বলা প্রয়োজন, কোন রকম জোর ক'রে তো দূরের কথা, অতি বিনীতভাবেও নজরুল কোনদিনই তাঁর কোন বইএর জন্য একটা অভিমত চেয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন নি।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে নজরুল

১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ এর ৭ই আগস্ট) রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হয়। শোকাহত নজরুল তখন 'রবিহারা' এবং 'সালাম অস্ত-রবি' নামে দুটি কবিতা লেখেন। এই কবিতা দুটি যথাক্রমে ১৩৪৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সওগাত' এবং ১৩৪৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'রবিহারা' কবিতাটি তখন নজরুল কলকাতা বেতারে নিজে আবৃত্তিও করেছিলেন। এছাড়া 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' নামে নজরুল ঐ সময় একটি গানও রচনা করেছিলেন। 'রবির জন্মতিথি' নামে তখন একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

'রবিহারা' কবিতার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢ'লে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে' এল দলে দলে। উদাস গগন-তলে,
বিশ্বের রবি, ভারতের কবি, শ্যাম বাঙ্লার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে ব'লে।
তব ধরিত্রী মাতার রোদন তুমি শুনেছিলে না কি,
তাই কি রোগের ছলনা করিয়' মেলিলে না আর আঁখি?
আজ বাঙ্লার নাড়ীতে নাড়ীতে বেদনা উঠেছে জাগি',
কাঁদিছে সাগর নদী অরণ্য, হে কবি, তোমার লাগি'।

* * * * *

আজি অসহায়
বাঙলার নর-নারী, কবিগুরু সান্ত্বনা নাহি পায়।
আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ
সে-আশিস্ যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।

'সালাম অস্ত-রবি' কবিতায় লেখেন—

কাব্য-গীতির শ্রেষ্ঠ-স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে! বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধূলির ধরণী জানি না সে কত দিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণীহীন

মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে ভবনে ও বনে একা ;
রেখায় রেখায় রূপ দেবে আর কাহার ছন্দ-লেখা ?
অপ্রাকৃত মদনে মাধবী চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়া
রূপায়িত রসায়িত করিবে কে লেখনী, তুলিকা নিয়া।
ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমী
আরবের ইস্রুল কায়েস্ যে ছিলে এক সাথে তুমি !
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙি'
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগ জাগি
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস !

'রবির জন্মতিথি' কবিতায় নজরুল লেখেন—

... ... অন্ধ মানব
রবি ডুবে গেল ব'লে করে কলরব।

কবিতা ও গান সুর-নদী হয়ে বয়
রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয় !

১৩৮৩ সালের ৯ই আশ্বিন তারিখের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য 'নজরুল কণ্ঠ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি যে সব রেকর্ডে নজরুলের গান ও আবৃত্তি ধরা আছে, তার একটা তালিকা দেন। ঐ তালিকায় নজরুলের 'ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিরে' গানটি সম্বন্ধে কল্যাণবন্ধুবাবু লিখেছেন—নজরুলের গাওয়া ঐ গানে সহযোগিতায় ছিলেন, ইলা মিত্র (ঘোষ) এবং সুনীল ঘোষ।

গানটি এই—

ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না।
(যে) সহস্র করে রূপরস দিয়া / জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া,
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না॥
যে তেজ শৌর্য্য শক্তি দিলেন আপনারে করি' ক্ষয় /
তাই হাত পেতে নাও

বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদেরে নিত্য দেবেন জয়/কবিরে ঘুমাতে দাও।
অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি / সেইখানে তাঁরে নিত্য

কর প্রণতি

(আর) কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না॥

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত নজরুল কবিতা ও গান রচনা করেছেন, নিজের লেখা কবিতা বেতারে আবৃত্তি করেছেন, নিজের লেখা গান রেকর্ডে গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সভায় যেমন যোগ দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তেমনি রবীন্দ্র শোক সভায় সভাপতিত্বও করেছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১৩৪৮ সালের ৩০শে শ্রাবণ (১৯৪১-এর ১৫ই আগস্ট) তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল—

গত রবিবার পূর্বাহ্ণে 'সব্যসাচী' কার্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক শোক সভা হয়। কবি নজরুল ইসলাম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

নজরুলের একটি রচনা :
‘বড়র পিরীতি বালির বাঁধ’

‘তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদী। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনী ব’লে ফেলেছিলাম!... এরি মধ্যে একদিন এ্যাসিস্‌টেন্ট জেলার এসে খবর দিলেন, ‘আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবি ঠাকুর তাঁর ‘বসন্ত’ নাটক উৎসর্গ করেছেন!’

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু’-একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজকয়েদী। আমার চেয়েও বেশি হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুবী গল্পও সত্যি হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যি সত্যিই আমার ললাটে ‘অলক্ষণের তিলক রেখা’ এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক রেখাই বটে! কারণ এরপর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দী বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনের বার করে নিন্দা করলেন! আমার হয়ে গেল বরে শাপ!

জেলের ভেতর থেকেই শুন্‌তে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনাইত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হ’ল না। বিশেষ ক’রে যখন শুনলাম, আমার অগ্রজপ্রতিম কোন কবি-বন্ধু সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ ‘লীড্’ করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দুজনেই জানতাম, তা নয়; দেশের সকলেই জান্‌ত তাঁর গদ্যে পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী ব’লে যারা হেঁইয়ো হেঁইয়ো ক’রে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে, শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি, বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার। মনের মনে কেঁদে বল্‌লাম, হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে?

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা ক’রে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে; যেমন ক’রে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

এমন কি, আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথা-শিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ-কথা ফাঁস ক'রে দিলেন! কবি হেসে বললেন,— যাক্ আমার আর ভয় নেই তাহ'লে!

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দু'চারটে কবিতা গানও শুনিয়েছি— অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশতঃ তার অতি প্রশংসালাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভাল বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সঙ্কোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হ'ল, আমি বর পেয়ে গেলাম।

অনেকদিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় ব'সে মন্ত্র গ্রহণের অবসর ক'রে উঠতে পারলাম না। বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন—'তুমি তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁচছ— তোমাকে জনসাধারণ একেবারে থানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে—' ইত্যাদি।

আমি দেখেছি, এ গৌরবে আমর মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি ক'রে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন-চার বছর ধ'রে "শুভানুধ্যায়ীরা" গালিগালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ্ মিটল না।...

ফি শনিবারের চিঠি এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানি রসিকতা আর 'মেছো হাটা' থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমিই এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্!

বাংলায় 'রেকর্ড' হয়ে রইলো আমায় দেওয়া এই গালির স্তূপ! কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! ফি হপ্তায় মেল (ধাপা মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন, এ ঘোড়া-রোগ — এ স্বদেশপ্রেমের বাই উঠল কেন? কোথায় তুই হাঁ করে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে

মলয় হাওয়া, দেখ্‌বি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি 'আয়লো অলি কুসুম কলি' গান — তা না ক'রে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি — জেলে, টানলি ঘানি, করলি বদ্‌খেয়াল, পরলি শিকলবেড়ী, ডাণ্ডাবেড়ী। বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত — এ কোন্ রকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হাঙ্গামা হুজ্জুৎ?

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে! সাহিত্যের বেণু বনে, এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশী অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট্‌-ছুট্! যত মোলায়েম ক'রেই বেণু বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশ বনই হয়ে ওঠে, তা কোন্ পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে?

বেচারী তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্ত মহারথীর সমাবেশ! বাইরে ছেলে-মেয়ের ভিড় জমে গেল! ঘন ঘন হাততালি! বলে, 'এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়।' কিন্তু শুধুই কি সপ্ত মহারথীর মার? তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ! ধূলো কাদা গোবর মাটি — কোন রুচির বাছ্-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে!

মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আনা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামীতে সাহিত্যের বেণুবন যে পুকুরপাড়ের বাঁশ বাগান হয়ে উঠল।

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমে তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিক্‌টিকি; পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙ্গা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক্ এতদিনে একবার প্রাণ ভ'রে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন ক'রে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল! কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্তরথীর সপ্তপ্রহরণে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি?

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ, আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তারা আমার লেখার ভক্ত।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, এতে আমার অপরাধটা কিসের হ'ল? বহু কণ্ঠের হুঙ্কার উঠলো, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাতত আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছি নে। ওর জন্য দু'-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে, আমায় নিয়ে কেন টানাটানি?

আবার নেপথ্যে শোনা গেল,—তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কবুল করতে দেরি লাগবে না।

দেখাই যাক...

এতদিন আমি, উপেক্ষাবশতঃই এ ধোঁয়াবাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁওয়া ছাড়িনি—না উনুনের, না সিগারেটের! ভেবেছিলাম সম্রাটে সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু হাতিতে হাতিতে লড়াই হ'লেও নলখাগড়ার নিস্তার নেই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়ায় কোন পৌরুষ নেই।

পলিটিক্সের পাঁককে যাঁরা এতদিন ঘৃণা ক'রে এসেছেন, বেণুবনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে—বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির লক্ষ্য ক'রে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়েছেন একেবারে দল লক্ষ্য ক'রে। কারণ, তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে! এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ ক'রেছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ ক'রে থাকি ব'লেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে-বেছেই বাঁশ ছোঁড়া হচ্ছে—বাণ নয়! অবশ্য, সে বাঁশ বাঁশীর মত গোটাকতক ফুটো ক'রে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশী নয়—বাঁশ!

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানী মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত' বলা দুষ্কর!...

আজকের—'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সেনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ, ভীষ্মসম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু বধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেন নি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে ক'রে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায়—'রক্ত'কে খুন বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপী পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হ'য়ে উঠি কেন বুঝতে পারিনে।

এই আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিষ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশের অনেকেই পায়জামা শেরওয়ানী টুপি ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায়

না। তাতে তাদের কেউ বিদ্রূপ করে না। তাদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন ওরিয়েন্টাল। কিন্তু ঐ গুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় মিঞা সাহেব! মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হ'লে কে যে হারবেন বলা মুস্কিল—তবুও এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি টুপি পায়জামা শেরওয়ানী দাড়িকে বর্জন ক'রে চলেছি শুধু ঐ 'মিঞা সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই, তবুও নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বল্‌ব, কিন্তু নাজির পেশকার উকিল মোক্তারকে কি বল্‌ব?

কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালীকে উদ্দেশ্য ক'রে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি—'ঘোমটা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা'ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভাল শোনবার লোভেই, ঐ একটি ভিন্ দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবিও দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু "খুন" নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে, ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তী ও ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাঙলা কাব্যলক্ষ্মীকে দুটো ইরাণী 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাকে আরও খুবসুরতই দেখায়।

আজকের কলালক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই-ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তাছাড়া যে 'খুনের' জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায় 'কালার বক্সে' (Colour box-এ) এবং তা 'খুন করা' 'খুন

হওয়া' ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়, হৃদয়েরও খুন খারাবী হ'তে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমানপাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গানে আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার'। এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়ত তাঁর ও কথার উল্লেখ। তিনি 'রক্তের' পক্ষপাতী অর্থাৎ ও লাইনটাকে—'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার'ও করা চল্‌ত। চল্‌ত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স ক'মে যেত। আমি সেখানে খুন শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশন্যাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর ক'রে 'খুন ধারা' লিখি নাই। তাই ব'লে 'রক্ত-খারাবী'-ও — লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবী' লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে, কিন্তু ওতে 'রাগ' মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না — নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুনাখুনি' খেলিনা, কিন্তু 'খুন-সুড়ি' হয়ত করি।

কবিগুরু কেন,—আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না। চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য সভায় ভিড় না ক'রে হিন্দু-সভারই মেম্বার হ'ন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ভাবী কালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নূতন-শব্দ-ভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয় তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জ'মে জ'মে ওঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নৈলে আরবী ফার্সী শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে।

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যেদিন দেখি কতকগুলো জোনাকি পোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা লোকগুলোই, যারা রাত দিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত সুন্দর মনকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে? আর, আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু?

কবিগুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ ক'রে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম ব'লে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনে।

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায়—কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটীরে পদার্পণ করেন নি—হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হ'ত না তাতে—নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন ক'রে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব'সে সর্বদাই মন খুঁত খুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাব্‌কাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবিগুরুর কাছেও শুধু ঐ দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুরসভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীনভক্ত তীর্থযাত্রা করতে পারল না ব'লে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তাহ'লে এই পোড়া কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কী-ই বা বল্‌বার আছে!

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুণ তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস ক'রে যেন আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে না দেন! শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না।

কবিগুরুর চরণে ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন—যদি আমাদের দোষ ত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর-অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নেব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিৎ বিদ্রূপ আর গালিগালাজই

করতে শিখেছে, তাঁকে তাদেরি বাহন হ'তে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায় বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি সম্রাটের আসন — রবিলোক — কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে।

কথা-সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র শনিবারের চিঠিওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন, আর যাই করুন (জানি না, এ সংবাদ সত্য কিনা)। ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেন নি। অসহায় মানুষের দুঃখ বেদনাকে তিনি এত বড় ক'রে দেখেছেন ব'লেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম, যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরী ক'রে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘু'রে বেড়ায় যে সব হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে — ফ্রি অব্ চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, ম'রে কুকুর হয়েছে! শুনলাম ঐ মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে!

ঐ গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলেছিলাম, শরৎদা সত্যিই একজন মহাপুরুষ। সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি ক'রে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার রূপ দেখতে পেয়েছেন।

আজ তাই একটি মাত্র প্রার্থনা, যদি পর জন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।'

নজরুলের এই লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের ১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৭) তারিখের সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়। নজরুলের এই 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' রচনার বা প্রবন্ধের শিরোনাম, বাংলা ভাষায় একটি অতি পরিচিত প্রবাদ। এই প্রবাদটির অর্থ, বড়লোকের সঙ্গে সাধারণ লোকের বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্ক বড় একটা স্থায়ী হয় না। বালির বাঁধের মতই ভেঙ্গে যায়। কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের —

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ।

থেকে প্রবাদটি এসেছে।

নজরুল তাঁর রচনার এই নাম দিয়ে প্রধানতঃ বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মত বৃহতের সঙ্গে তাঁর মত ক্ষুদ্রের স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক টিকল না। তাই তিনি

তাঁর রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ এনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কয়েকটা অভিযোগও এনেছেন। আনলেও নজরুল অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত বিনীতভাবেই বলেছেন। এছাড়া নজরুল তাঁর এই লেখায় প্রসঙ্গতঃ তাঁর প্রতি তখনকার কোন কোন লেখকের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আক্রমণ এবং তাঁর নিজের জীবনেরও কিছু কিছু কথা প্রভৃতি বলেছেন। নজরুল সূত্রাকারে বা সংক্ষেপে সেসব কথা বলেছেন।

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে এই কথাগুলো লিখেছেন—

১. বেচারী তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্ত মহারথীর সমাবেশ!... মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আনা ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু-বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশ বাগান হয়ে উঠল।

২. কথাসাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র শনিবারের চিঠিওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন, আর যাই করুন (জানি না, এ সংবাদ সত্য কিনা), ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেন নি। অসহায় মানুষের দুঃখ বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি-গিয়ে উঠেছে।

৩. কবিগুরুর চরণে ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন— যদি আমাদের দোষত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নেব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিত বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে, তাঁকে তাদেরই বাহন হ'তে দেখলে আমার মাথা লজ্জায় বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি সম্রাটের আসন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে।

নজরুলের এই কথাগুলোর মধ্যে তখনকার বাংলা সাহিত্যের একটা ঐতিহাসিক বিবাদ বা আন্দোলনের স্পষ্ট আভাস রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের তখনকার সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের কথাটা এখানে একটু বিস্তৃতভাবেই বলছি—

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের ছুটিতে প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিল্লী শহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অমল হোম 'অতি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

'...গল্পের পর গল্প পড়িয়া যাই—'মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। এ কী কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়া-কান্না বাংলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল।

ইহাই কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য ?...'

অমলবাবুর এই 'অতি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য' প্রবন্ধটি ১৩৩৩ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই মাঘ মাসেই শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও মোহিতলাল মজুমদার একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এঁদের দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে যে নোংরামি দেখা দিয়েছিল, সে কথা তাঁকে জানানো এবং সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সজনীবাবু লিখেছেন—

'গত ২০শে মাঘ তারিখে আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথাবার্তার পর মোহিতবাবু বাংলা সাহিত্যে বর্তমান দুর্নীতি বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন যে, বাংলা সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। 'কল্লোল', 'কালিকলম', শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া ছিলেন — তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এই বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন — শিক্ষা-দীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিতপটুত্ব তাঁহাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখিতে চায় না। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত পণ্ডিতজন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন, তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে।

অন্যান্য আরও অনেক কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছা-ক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, সেই সাহিত্যকে লইয়া এভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্যে একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রে আসার মাসখানেক পরে ২৩শে ফাল্গুন (১৩৩৩) তারিখে সজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যে এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকেও অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। এ সম্বন্ধে সজনীবাবু তাঁর 'আত্মস্মৃতি' ১ম খণ্ডে লিখেছেন—

'তখনকার বাংলা সাহিত্যে আমার মতে যে সকল অনাচার চলিতেছিল, আমি সেই সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই

প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া ছিলাম। তাঁহার আগেরকার সাহিত্য সমালোচনা হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তাঁহাকে সচেতন ও সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানাইয়া ছিলাম—

পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে, তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ...কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা ? যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে ?'

সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

শ্রীচরণেষু,

প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলা দেশে এক ধরণের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানতঃ 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প।...

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে।

আপনি এ সব লেখার দু একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে শনিবারের চিঠিতে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এ প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোন প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাংলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন, তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী করতে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে থাকি, তাহলে এই ভেবে ক্ষমা করবেন যে, আমি একা নই—আমার এই চিঠিতে আমি অন্তত আমার পরিচিত কুড়ি বাইশজন সাহিত্যিকের মনোভাব ব্যক্ত করেছি।

প্রণত

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সজনীবাবুর এই চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ উত্তরে সজনীবাবুকে লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

কঠিন আঘাতে একটা আঙ্গুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধূলো দিগ্‌ দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে, তখন আমার যা বলবার বলব। ইতি—২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ সজনীবাবুকে এই চিঠি দেওয়ার কয়েক মাস পরে, পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে বেরুবার ঠিক আগে ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে বাঙ্গলার তৎকালীন নব্য-সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ করে 'সাহিত্য ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ঐ আষাঢ় মাসেই মহা আড়ম্বরে 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয়। বিচিত্রার প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বিচিত্রার দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তখন মালয়ে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণকালে জাভা থেকে বালি যাবার পথে প্লানসিউজ জাহাজে 'যাত্রীর ডায়ারি' আকারে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' এই দুটি প্রবন্ধই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে বাঙ্গলার তৎকালীন কোন সাহিত্যিকেরই নাম করেন নি। কিন্তু তা হ'লেও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের লেখার সুর থেকে বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া নরেশবাবু জানতেন, শনিবারের চিঠির দল তাঁকেই নব্য-সাহিত্যিক দলের অগ্রণী ব'লে থাকেন এবং তিনি সাহিত্যিক পরম্পরায় এও শুনেছিলেন

যে, সজনীবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে, বিশেষ ক'রে তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে দরবার করেছিলেন। তারই ফলে নাকি রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ। তাই নরেশবাবু তরুণ সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখে বিচিত্রায় পাঠিয়ে ছিলেন। বিচিত্রার ভাদ্র সংখ্যায় নরেশবাবুর ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'ল।

এদিকে সজনীবাবু শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে ধর্ম' প্রবন্ধ দেখে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আবেদন সার্থক হয়েছে। এই ভেবে তিনি তাঁর ভাদ্র মাসের শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আবেদন করা পত্রটি এবং সেই পত্রের উত্তরে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, দুই-ই এক সঙ্গে প্রকাশ করলেন। আর ঐ সঙ্গে সজনীবাবু ২০শে মাঘ তারিখে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর ও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে আলোচনা হয়েছিল তাও প্রকাশ করলেন।

'বিচিত্রা'য় নরেশবাবু যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন, ভাদ্র মাসের 'বঙ্গবাণী'তে তেমনি গিরিজাশংকর রায় চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখেছিলেন।

'বঙ্গবাণী'র অন্যতম পরিচালক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন। উমাপ্রসাদবাবু সেই সময়ে শরৎচন্দ্রকে লেখা এক পত্রে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত গিরিজাবাবুর ঐ প্রবন্ধের উল্লেখ করেছিলেন এবং 'সাহিত্য ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর কি মত্ তা নিয়ে বঙ্গবাণীতে কিছু লিখতে বলেছিলেন।

উমাপ্রসাদবাবুর এই অনুরোধে শরৎচন্দ্র তখন উমাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন—

'একথা তোমার সত্য যে আমারও একটি স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেছেন, আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে। কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটি অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ ক'রো।'

শরৎচন্দ্র নিজের অভিমত লিখে পাঠিয়ে দেবেন ব'লে তখন উমাপ্রসাদবাবুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি অনুযায়ী তিনি 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেন। শরৎচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধ বঙ্গবাণীর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি নিয়ে 'বিচিত্রা' ও 'বঙ্গবাণীতে' যেমন আলোচনা চলেছিল, তেমনি ঐ সময় 'প্রবাসী'তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজদুর্লভ হাজরা এবং 'আত্মশক্তি'তে মুসাফির-ও এই নিয়ে আলোচনায় নেমেছিলেন। মুসাফির আত্মশক্তিতে তাঁর 'সাহিত্যের মামলা' নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ শরৎচন্দ্রেরও কথা বললে, তখন শরৎচন্দ্র এই নিয়ে আত্মশক্তিতে একটা লেখা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ লেখায় প্রবাসীর লেখক ব্রজদুর্লভ হাজরার লেখারও প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্রজদুর্লভবাবু আত্মশক্তিতে শরৎচন্দ্রের লেখা প'ড়ে তার একটা প্রতিবাদ করেন। আবার শরৎচন্দ্রও সংক্ষেপে এর একটা উত্তর দেন। এগুলি সবই তখনকার আত্মশক্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র 'প্রবাসীতে' ব্রজদুর্লভ হাজরার লেখা প'ড়ে 'আত্মশক্তি'তে তার প্রতিবাদে লিখেছিলেন —

এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজদুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, 'এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত, সেইরূপ অর্থোপার্জনের জন্যই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থ-রচনায় নিযুক্ত। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 'হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।'

এই ব্যক্তি ডেপুটি-গিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে দারিদ্র্য অপরাধ নয়, সর্ব দেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজদুর্ল্লভবাবু না জানিতে পারেন কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের তো এ-কথা অজানা নয় যে সাহিত্যের ভাল-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি চড়া না চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এত বড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায়, সেটা ভদ্র সমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জন করিলেই সাহিত্যের 'রসের' বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে, কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।'

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ নিয়ে সাহিত্যিক মহলে এইভাবে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ায়, সেই সময় 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' প্রবীণ ও নবীন

সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেছিলেন। ১৩৩৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র তারিখে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা ভবনে দুদিন এই সভা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দুদিনই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি 'সাহিত্য রূপ' নামে একটি লেখা এবং দ্বিতীয় দিন 'সাহিত্য সমালোচনা' নামে আর একটি লেখা পড়েছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকজনের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছিলেন। তাঁর ঐ লেখা দুটি (শেষেরটিতে কয়েক জনের প্রশ্নের উত্তরসহ) তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঐ আলোচনা সভায় প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে অমল হোম, সজনীকান্ত দাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এঁরাও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এঁরা কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনের সভায় তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেছিলেন '—আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে, এই ইচ্ছা ক'রে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনা করবো; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা ক'রে নেওয়া যাবে তা মনে ক'রে নয়। অনেক সময় আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না ব'লে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা ক'রে নিই; তাতে ক'রে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়। তখন কোনো প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না যে, যে জিনিষটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দু পক্ষেরই দরদের জিনিষ, সেটা বাংলা সাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির ক'রে দেখা দরকার।'

আর দ্বিতীয় দিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের প্রথম দিকে বলেছিলেন—'ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নেই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর এক পক্ষে আছে। এ রকমভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব। —এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষকে উপলক্ষ্য করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল, যে গুলিকে সাহিত্যধর্ম বিগর্হিত মনে হয়েছিল।'

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ প'ড়ে শরৎচন্দ্র তখন তৎকালীন নব্য-সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে দু একটা কাগজে যা লিখেছিলেন, এক বৎসর পরে কিন্তু তাঁর সে মত বদলে যায়।

তাই কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানালে অভিনন্দনের উত্তর-দান কালে প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেছিলেন,—

'অনেক দিন পূর্বে, বোধ হয় আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণী'তে তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ ক'রে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কিনা? তারপর থেকে দু' একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নি, তখন নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরোচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।

এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী বোধ হয় ২০।২৫ জন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন—'দুঃখের ব্যাপার এই, আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, আমরা লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়ত মনে করে, এসব জিনিষ আমরা খুব ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা সুযোগ পান আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ সব জিনিষ আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়, তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখলে, তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেই জন্য সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। আমাদের হয়ে এ কথা তাদের জানাবেন।'

আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারবার মনে পড়ে। সেদিন তাঁর কথা আমার না বললেও হ'ত। মনে হয়েছিল সত্য ছিলনা, কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে।'—মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩৬।

'আত্মশক্তি'তে মুসাফির তাঁর 'সাহিত্যের মামলা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলেছেন যে, নবীন লেখকরা সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন বলেই তাঁদের সাহিত্য হয়ে উঠছে কুৎসিৎ।

দু জনার মাঝে কেউ যে নবীন লেখকদের লেখা পড়বার সময় ও সুবিধা পান, তা আমার মনে হয় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখে আর শরৎচন্দ্র মুখে ব'লে যে দণ্ডাদেশ দিয়েছেন, তা সঙ্গতও হয়নি, শোভনও হয়নি।

...রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যে 'কল্লোল' বা 'কালি কলম' নিয়মিত পড়েন, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। ...কিন্তু না পড়লেও ঐ সব লেখার কথা তাঁরা

শুনলেন কাদের কাছে? যারা স্থানে-অস্থানে কারণে-অকারণে ঐ সব লেখার নিন্দা প্রচার করে তাদেরই মুখে নিশ্চিত। সুতরাং 'সাহিত্য ধর্ম' বা রূপনারায়ণের তীরের আশ্রমে কথিত 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' আবদারের ফলে প্রস্তুতও হতে পারে।'

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখায় বলেছেন— 'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে;... এমন কি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিরোধী কোন একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।'

নজরুলের এই রবীন্দ্র-ভক্তির কাহিনীটি হ'ল—

নজরুল খুব অল্প বয়সেই কিভাবে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এবং তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের একজন বড় ভক্ত হয়ে ওঠেন।

বালক নজরুল তখন স্কুলে পড়েন। তাঁর এতটা রবীন্দ্র-ভক্তি দেখে তাঁর স্কুলের সহপাঠী বন্ধুরা তাঁর সামনে রবীন্দ্র-বিরুদ্ধ কথা ব'লে তাঁকে ক্ষ্যাপাতো।

একবার গ্রামে চুরুলিয়ায় খেলার মাঠে বন্ধুরা নজরুলকে এইভাবে রাগাতে থাকলে, নজরুল তখন রাগে খেলার মাঠের গোল পোস্টের বাঁশ উপড়ে নিয়ে বন্ধুদের মারতে যান। এতে জগৎ রায় নামে একজনের মাথা ও কপাল কেটে রক্ত পড়তে থাকে।

এই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালতেও উঠেছিল। এবং বিচারকও নজরুলকে কারদণ্ডের আদেশ দেন। তবে অপরাধী নিতান্তই বালক ব'লে বিচারক নজরুলকে কারাবাসের বদলে কাঠগড়ায় কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে মুক্তি দেন।

জগৎ রায় পরবর্তী জীবনে ডাকবিভাগে চাকরি করতেন। নজরুল যখন হুগলীতে থাকতেন, তখন এই জগৎ রায় একদিন হুগলীতে এসে নজরুলের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে বলেছিলেন—এই দ্যাখ্, তোর হাতের জয়টীকা আজও আমার কপালে রয়েছে।

নজরুল লিখেছেন—'শুনলাম, আমারই অগ্রজ প্রতিম কোনো কবি-বন্ধু সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুরপক্ষ 'লীড' করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালোবাসার কথা শুধু যে আমরা দুজনেই জানতাম, তা নয়, দেশের সকলেই জানতো তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা গানের ঘটা দেখে।'

নজরুলের এই অগ্রজ-প্রতিম কবিবন্ধু মনে হয়, কবি মোহিতলাল মজুমদার। এখন এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি—

১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকায় হাফিজের ভাব ও ছন্দ অবলম্বনে লেখা নজরুলের 'বাদল-প্রাতের শরাব' কবিতা প্রকাশিত হয়। আর ঐ 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা।

'মোসলেম ভারতে' এই কবিতা দুটি প'ড়ে মোহিতলাল মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখন নজরুলের কবিতা দুটির প্রশংসা ক'রে স্বেচ্ছায় 'মোসলেন ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি চিঠিতে 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন— 'বাদল-প্রাতের শরাব শীর্ষক কবিতায় ইরাণের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।... বাঙালী মাত্রেই ইহার উজ্জ্বল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।'

আর 'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।... কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই।... ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গম্ভীর লাভ করিয়াছে।'

'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত মোহিতলালের চিঠি প'ড়ে নজরুল তাঁর বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে মোহিতলালের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এরপর উভয়ের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই উভয়ের মধ্যের এই প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মোহিতলালের সঙ্গে তখন প্রবাসী পত্রিকার ভাল সম্পর্ক ছিল না। মোহিতলাল নজরুলকে প্রবাসীতে লিখতে নিষেধ করেন। কিন্তু নজরুল মোহিতলালের সে নিষেধ না শুনে প্রবাসীতে লিখতেন, এখানে লিখে তিনি সম্মান দক্ষিণা পেতেন। এ ছাড়া মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের সুসম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আরও কারণ ছিল। এ সম্পর্কে সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে যা লিখেছেন, এখানে উদ্ধৃত করছি—

'একদিন বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সমিতির বাড়িতে নজরুলকে মোহিতলাল 'মানসী' পত্রিকায় (পৌষ ১৩২১) প্রকাশিত তাঁহার 'আমি' শীর্ষক একটি কথিকা পড়িয়া শোনান। ইহা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তাহার পর নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হইলে মোহিতলাল মন্তব্য করেন যে, নজরুল তাঁহার 'আমি' কথিকার ভাবসম্পদ আত্মসাৎ করিয়া 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখিয়াছেন। এই ঘটনার সূত্রে উভয়ের সম্পর্ক তিক্ত হইতে আরম্ভ হয়।

এই সময় সজনীকান্ত দাস নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে ব্যঙ্গ করিয়া 'কামস্কাটকীয় ছন্দে'র অন্তর্ভুক্ত 'ব্যাঙ' শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন (সাপ্তাহিক

'শনিবারের চিঠি' একাদশ বা পূজা সংখ্যা, ১৮ই আশ্বিন ১৩৩১; ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৪)। নজরুল ইহাকে মোহিতলালের রচনা বলিয়া ভুল করিয়া 'সর্বনাশের ঘণ্টা' বলিয়া একটি কবিতা লেখেন ('কল্লোল', কার্তিক ১৩৩১)। মোহিতলাল অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া 'দ্রোণ-গুরু' কবিতায় (সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি', ৮ই কার্তিক ১৩৩১; ২৫শে অক্টোবর ১৯২৪) নজরুলকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। তাহার পর নজরুলের সহিত তাঁহার আর মিলন ঘটে নাই।'

সুশীলবাবুর এ কথা সত্য হলেও আমরা কিন্তু দেখি, এ সবের অনেক পরে ১৩৫৫ সালে মোহিতলাল যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন, তখন তাঁর পত্রিকায় আর্ট পেপারে এক পৃষ্ঠা করে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ছেপে ছিলেন, তেমনি এক সংখ্যায় হাবিলদার বেশে নজরুলেরও একটি ছবি ছেপে ছিলেন। এতো নজরুলের প্রতি মোহিতলালের স্নেহ বা শ্রদ্ধারই নিদর্শন।

উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার শুরুতেও দেখেছি, ১৩২৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় মোহিতলাল 'কবি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ন: ই:-র উদ্দেশে' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

এবার নজরুল প্রসঙ্গ নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' বা সজনীকান্ত দাসের কথা—

সজনীকান্ত দাস নজরুলকে প্রথম দেখেন ১৩২৯ সালে মোহিতলাল মজুমদারের এক সাহিত্য-রসিক বন্ধুর বাড়িতে। পরে একদিন ট্রামে উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। শনিবারের চিঠি প্রকাশিত হ'লে সজনীকান্ত তখন অনেকটা তাঁর আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্যের খাতিরেই নজরুলের বিরুদ্ধে চ'লে যান এবং নজরুলের কবিতা নিয়ে প্যারডি, ব্যঙ্গ ও আক্রমণ করতে থাকেন।

নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সজনীকান্ত নজরুলের কবিতা নিয়ে কিরূপ প্যারডি, ব্যঙ্গ ও আক্রমণ করতেন, এখানে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি (১৩২৮ সালের ২০শে পৌষ) সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হ'লে, সেই কবিতা প'ড়ে সজনীকান্ত ১৯২৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠিতে 'ব্যাঙ্' নামে ঐ কবিতার একটি ব্যঙ্গাত্মক প্যারডি লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত তিনজনে মিলেও এই 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি প্যারডি রচনা করেছিলেন। সেই প্যারডি ছাপা হয়েছিল শনিবারের চিঠির ১৩৩১ সালের শারদীয় সংখ্যায়। কবিতাটির লেখক হিসাবে নাম ছিল 'শ্রীঅবলানলিনীকান্ত হাঁ, এম.এ., এ-জেড্।

'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর অশোক চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র) নজরুলের নাম দিয়েছিলেন, গাজী আব্বাস বিট্কেল। সজনীকান্ত ভাবকুমার প্রধান ছদ্মনামে গাজী আব্বাস বিট্কেলকে ব্যঙ্গ করে 'আবাহন' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদককে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। সেই চিঠি এবং কবিতা এখানে দিলাম। ছাপা হয়েছিল ১৩৩১ এর ২৮ শে ভাদ্রর সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে।

'শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়,

জাতীয় মহাকবি বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিট্কেলের বর্তমান ঠিকানা না জানাতে আপনার কেয়ারে আমার চিঠিখানা পাঠাইলাম; আশা করি আপনি কবিবরকে এই চিঠিখানা দিবেন। অগ্রেই ধন্যবাদ দিলাম।

ইতি — ভাবকুমার প্রধান

পুনঃ — জাতীয় কবিকে লেখা চিঠিখানি তো জাতীয় সম্পত্তি, সুতরাং আপনার শনিবারের চিঠিতে ইচ্ছা করিলে কবিতাটি ছাপাইয়া ধন্য হইতে পারেন।

বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিট্কেল সমীপেষু,
ওরে ভাই গাজি রে —
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে ঝাপে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা!...
দাবানল-বীণা আর
জহরের বাঁশীতে
শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুললি,
পুষ্পক দোলা দিয়া
মজালি যে কত হিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি।'

এই কবিতায় 'দাবানল-বীণা', 'জহরের বাঁশী ও 'ব্যথার দান' হ'ল নজরুলের 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' ও 'ব্যথার দান' গ্রন্থ তিনটি। এই কবিতাটিই সজনীকান্তের প্রথম মুদ্রিত কবিতা।

সজনীকান্ত 'শ্রীকেবলরাম গাজনদার' ছদ্মনামে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র হ'তে পৌষ সংখ্যা মাসিক 'শনিবারের চিঠি'তে নিদারুণ বিদ্রূপাত্মক একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক 'কচি ও কাঁচা' লেখেন। নাটকটির প্রথম তিনটি অঙ্ক ভাদ্র হ'তে কার্তিক সংখ্যায় এবং

চতুর্থ অঙ্কের দুইটি দৃশ্য অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পঞ্চম অঙ্কটি প্রকাশিত হয় নি। নাটকটির আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল নজরুলের রচনা।

১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত শ্রীকেবলরাম গাজনদার ছদ্মনামে নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাগুলির প্যারডি ক'রে তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রে প্রকাশ করেন।

সজনীকান্ত শুধু এইভাবে শনিবারের চিঠিতে নজরুলকে আক্রমণ করেই শান্ত ছিলেন না, তিনি ঐ সময় এ নিয়ে কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিকসহ নজরুলেরও বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন এবং একদিন মোহিতলালকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রের রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড়ের বাড়িতেও গিয়ে ছিলেন। এ কথা আগে বলেছি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের কোন কোন রচনা নিয়ে সজনীকান্ত তাঁকে আক্রমণ করলেও, তিনি নজরুলের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই নজরুল যখন দুরারোগ্য কঠিন অসুখে আক্রান্ত হ'ন, তখন তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে যে কমিটি গঠিত হয়, তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এই সজনীকান্ত এবং জুলেফিকার হায়দার।

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'য়ে লিখেছেন—

আজকের 'বাংলার কথা'য় দেখলাম,... কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে খুন ব'লে অপরাধ করেছি।... আমার একটা গানে আছে—'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।' এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়ত তাঁর ও কথার উল্লেখ।'

নজরুল জীবনীকার ডঃ রফিকুল ইসলাম বলেন—নজরুল ১৩৩৩ সালের গোড়ার দিকে তাঁর বিখ্যাত গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' লিখেছিলেন। তাতে আছে—

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লালে লাল হ'ল ক্লাইভের খঞ্জর।

নজরুল এ গান রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন এবং গানটি তখন পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই গানেই রক্তের বদলে 'খুন' দেখে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

রফিকুল ইসলামের অভিমত, রবীন্দ্রনাথ 'হত্যা' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি করেন নি; কিন্তু রক্ত অর্থে খুনের ব্যবহার সমর্থন করতে পারেন নি।

['উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার' 'কাণ্ডারি হুঁশিয়ার' গানেরই একটি পংক্তি]

'খুন' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বলার ইতিহাসটা হ'ল এই—

প্রেসিডেন্সী কলেজের 'রবীন্দ্র পরিষদ' ১৯২৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানায়। সভায় পরিষদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর অভ্যর্থনা ভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দেন, তাতে বাংলা সাহিত্যে তরুণ-কবিদের কবিতায় আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর সেদিনের সেই ভাষণ ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবাসী-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সেই ভাষণটি উদ্ধৃত করছি—

'সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টি ছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোন একজন বাঙালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি 'রক্ত' শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রং যদি না ধরে তাহলে বুঝ্ব সেটাতে তাঁরি অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না ব'লেই তাক্ লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে ওঠ্বার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বল্ব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনায় আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণ বর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের ঊষাকে নিয়ু মার্কেটে "খুন" ফরমাস করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক্। আর যে-বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্ত-বীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিনী বেজে ওঠে না, তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।'—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃঃ ৫৯৪—৯৫।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ যেমন 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি, একজন লিখেছেন, ৪ঠা পৌষ (১৩৩৪) তারিখের সাপ্তাহিক 'বাংলার কথা' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সংখ্যা 'বাংলার কথা' কোথাও পেলাম না। এ সম্পর্কে নজরুল-গবেষকদের কেউ লিখেছেন—'বাংলার কথা'য় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বিকৃত ক'রে, কেউ লিখেছেন —বক্তৃতার 'হিন্দু' শব্দটা বাদ দিয়ে ছাপা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় পরিষ্কার ছিল—'একজন বাঙালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম'।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা থেকে এই 'হিন্দু' শব্দটা বাদ দেওয়াতেই বাধ্‌ল যত গোলমাল। 'বাংলার কথা' প'ড়ে নজরুল ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লক্ষ্য করেই একথা বলেছেন। নজরুলের অনেক বন্ধুও তাঁকে বললেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লক্ষ্য করেই একথা বলেছেন। এতেই নজরুল শ্রদ্ধা সহকারে হ'লেও এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনেক কথাই শোনালেন তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখায়।

মাসিক 'সওগাত' পত্রিকাও এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে লেখেন—'বাংলার কথা'য় রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আধুনিক কবি 'রক্তের' মত চিরন্তন শব্দের স্থানে মাঝে মাঝে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা আধুনিক কবির পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।...

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইয়াছে, লজ্জাও হইয়াছে; কারণ শনিবারের চিঠির লেখকদের নিকট হইতে আমরা একথা শুনিতে প্রস্তুত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা এ কথা শুনিব, ইহা আমরা কল্পনাও করি নাই।'

রবীন্দ্রনাথ ঐ 'খুন'-এর আলোচনার কোন উত্তর না দিলেও বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী কতকটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়েই ২০শে মাঘ ১৩৩৪ (৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) তারিখের সাপ্তাহিক আত্মশক্তিতে 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে বলেন—

'রবীন্দ্রনাথ যে কাজি সাহেবকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলেছেন,—এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে-সভায় তিনি ও-কথা বলেন সে-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কোন উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ-স্বরূপ তিনি 'খুনের' কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন নি।

বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না। কারণ, কাজি সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তা'র পাতা উল্টে গেলে 'খুনে'-র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এ সব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না।'

বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বলা 'বাঙালী হিন্দু কবি' কথাটা না বললেও, নজরুল বীরবলের ঐ প্রবন্ধ প'ড়েই নিজের ভুল বুঝতে

পারেন। এরপর তিনি একদিন প্রমথবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথও পূর্ববৎ তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ করেন।

নজরুল লিখেছেন — ওঁর (রবীন্দ্রনাথের) আমাদের উদ্দেশ্য ক'রে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন —

'অন্যান্য সকল বেদনার মতই সাহিত্যে দারিদ্র্য-বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে; যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরা'ই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ, এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চল্‌তি প্রেসক্রিপশনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি। ভালো রকম উপার্জনও করেন, সুখে সচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এই জন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।'

এখানে দেখা যাচ্ছে — রবীন্দ্রনাথ তো সাহিত্যিকদের দারিদ্র্য বা তাঁদের দরিদ্র অবস্থা নিয়ে কোনও কথা বলেন নি! বরং বলেছেন, অনেক লেখক ভাল রকম উপার্জন করেন এবং সুখে সচ্ছন্দেও থাকেন।

লেখকরা দেশের লোকের দারিদ্র্য নিয়ে লেখেন বলেই ক'টা কথা বলেছেন।

তবে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে ঐ বাদ্‌বিতণ্ডার সময় জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজদুর্লভ হাজরা এই বাদ্‌বিতণ্ডায় যোগ দিয়ে তখন আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর এক প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যিকদের দারিদ্র্য নিয়ে খোঁচা দিয়ে লিখেছিলেন — হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র ব্রজদুর্লভবাবুর এ কথার উত্তর দিয়েছিলেন, তখনকার আত্মশক্তি পত্রিকায়। এ কথা একটু আগেই বলেছি।

নজরুল তাঁর এই প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন — 'বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত।'

এই সময় পর্যন্ত নজরুলের 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থ দুটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। পরে হয় তাঁর 'প্রলয় শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যগ্রন্থ

দুটি। এবং প্রবন্ধ পুস্তক 'যুগবাণী'। তাঁর 'ফণি-মনসা' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্তর মুখে এসেও কোন রকমে রক্ষা পায়।

নজরুল তাঁর এই লেখায় তাঁর চরম দারিদ্র্যের কথা বলেছেন। তিনি 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখেন ১৯২৭এর ডিসেম্বরে। এই ১৯২৭ এর ২০শে এপ্রিল নজরুল তাঁর এক বইয়ের প্রকাশককে লিখছেন — আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।... বাড়িতে একটা পয়সাও নাই। তুমি পত্রপাঠ মাত্রেই অন্তত কুড়িটি টাকা T.M.O. করিয়া পাঠাও। নইলে বড় মুস্কিলে পড়িব। বহু দেনা করিয়াছি, আর টাকা পাওয়া যাইবে না।

শুধু এই সময়েই নয়, নজরুল একরূপ জীবনভোরই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান। তাও আবার অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন।

অর্থাভাবের জন্য মাঝে মাঝে স্কুলের পড়া ছেড়েছেন, আবার ধরেছেন। পড়া ছেড়ে কখন রুটির দোকানে চাকরি করেছেন, কখন 'লেটো'র গানের দলে যোগ দিয়ে গান ও পালাগান রচনা করেছেন। এইভাবে কোন রকমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। স্কুলে টেস্ট পরীক্ষার সময় যুদ্ধে চাকরি নিয়ে চলে যান। ঐ সময়টায় অবশ্য খাওয়া পরায় নিশ্চিন্ত ছিলেন। যুদ্ধের চাকরি থেকে ফিরে সাহিত্য সাধনা, পত্রিকা সম্পাদনা এবং পত্রিকার চাকরি প্রভৃতি নিয়ে জীবন কাটান। পরে গ্রামোফোন কোম্পানীতে সংগীত রচনা ও সংগীত শিক্ষকের যখন কাজ নিয়েছিলেন, তখনই যা কিছুদিন অনেকটা সচ্ছল অবস্থায় কাটিয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় অন্য সব সময়েই তাঁকে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে।

তাঁর অনেক চিঠিপত্রে এসব দারিদ্র্যের কাহিনী রয়েছে। সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা একটা চিঠিতে এবং মধুপুর থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর কী নিদারুণ দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে! হায়দার সাহেবকে লেখা চিঠিটি 'মরমী কবি নজরুল' গ্রন্থের লেখক রণজিৎ চক্রবর্তীর বইয়ে (১৬১ পৃঃ) আছে।

শ্যামাপ্রসাদকে লেখা চিঠিটি আছে, 'শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে। নজরুল শেষ বয়সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে, শ্যামাপ্রসাদ নজরুলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং নজরুলের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁদের মধুপুরের বাড়িতে গিয়ে নজরুলের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তখন তাঁকে অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেন।

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'য়ে নজরুল লিখেছেন — একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম, যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত

আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরি করে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যে সব হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে— ফ্রি অব্ চার্জ।'

এখানে নজরুলের বর্ণিত কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হলেন, শরৎচন্দ্রের মাতুল ও আবাল্যবন্ধু ভাগলপুর-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুরেনবাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পঞ্চম বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের দ্বিতীয় পুত্র।

নজরুল লিখেছেন— তিনি সুরেনবাবুর কাছে গল্প শুনেছিলেন— পথের কুকুরদের জন্য শরৎচন্দ্রের মঠ তৈরি ক'রে দেবার কথা।

এ কাহিনীটি গল্প নয়। অনেকটা সত্যই। পথের কুকুরদের জন্য শরৎচন্দ্রের কত যে দরদ ছিল, তার বহু কাহিনী আমার শরৎচন্দ্র—১ম খণ্ড (জীবনী) গ্রন্থে বলেছি। এখানে তার দু একটা কাহিনী বলছি—

শরৎচন্দ্র একবার পূজার ছুটির সময় ভাগলপুরে মামার বাড়িতে গেলে, তাঁর এই মাতুল সুরেনবাবু ও সুরেনবাবুর ভাই গিরীনবাবু, শরৎচন্দ্রের সংগে ঠাকুর-চাকর নিয়ে স্টীমারে ক'রে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন। গিরীনবাবু ১৩৩৫ সালের 'কালি-কলম' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের সেই স্টীমার ট্রিপের কথা উল্লেখ করেছিলেন। পরে সুরেনবাবু ঐ বছরেরই 'কালি-কলমে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে তাঁদের সেই স্টীমার ট্রিপটি লিখে ছিলেন। সুরেনবাবু পরে তাঁর ঐ প্রবন্ধটিকে তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করেন। ঐ বইয়ে সুরেনবাবুর ঐ প্রবন্ধটি ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী। এখানে সংক্ষেপে সেই স্টীমার ট্রিপের একটা কাহিনী দিচ্ছি।—

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দু তিনটা ঘোড়ার গাড়ীর উপর পর্বত প্রমাণ জিনিস-পত্র চাপিয়ে সকলে মিলে ভাগলপুর স্টীমার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেন। ঘাটে গিয়ে স্থির করলেন— যে দিকের স্টীমার আগে পাওয়া যাবে, তাতেই চ'ড়ে তার শেষ গন্তব্য স্থান পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

ঐ সময় পাটনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা স্টীমার সার্ভিস ছিল। স্টীমার পাটনা থেকে ছেড়ে ভাগলপুর হয়ে শেষে পদ্মায় প'ড়ে গোয়ালন্দে আসত। তারপর সুন্দরবন হয়ে ডায়মণ্ডহারবার দিয়ে কলকাতায় খিদিরপুরে আসত। আবার ঠিক এমনি বিপরীতভাবেই কলকাতা থেকে পাটনায় যেত।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর দুই মাতুল স্টীমার-ঘাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলেন, স্টীমার কলকাতা যাওয়ার জন্য আসছে। স্টীমারের নাম 'ভেনাস'। ভেনাস ঘাটে এলে, সকলে মিলে মোটঘাট নিয়ে ভেনাসে গিয়ে উঠলেন। স্টীমারের একতলায় মালপত্র ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা থাকত। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা দুতলায় কেবিনে

যেত। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে কেবিনে গিয়ে বসলেন।

ভেনাস ছেড়ে দিলে শরৎচন্দ্র ভৃত্যকে তামাক সেজে দিতে বললেন। ভৃত্য তামাক সেজে দিলে শরৎচন্দ্র কেবিনের ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় তামাক টানতে লাগলেন।...

কিছু পরে ভেনাস কাহালগাঁয়ে এসে পৌঁছল। কাহালগাঁ একটা স্টীমার স্টেশন। এখানে স্টীমার কিছুক্ষণের জন্য থামে। তাই শরৎচন্দ্র স্টীমার থেকে নেমে এলেন।

এদিকে স্টীমার ছাড়বার সময় হয়ে গেল, তবুও শরৎচন্দ্র আসছেন না দেখে, তাঁর মামারা তাঁকে খুঁজতে গেলেন। তাঁরা গিয়ে দেখেন, স্টীমার-ঘাটের অদূরে যাত্রীদের নিকট খাবার বিক্রয়ের জন্য যে ছোট দোকানটি আছে, তার সামনের মাঠে শরৎচন্দ্র বসে আছেন। তাঁর চারদিকে পনের-কুড়িটি কুকুর 'দহি-চুড়া'র ভোজে রত। একটি বছর বার-তের বয়সের ছেলে শরৎচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে—তার দুহাতে দই, চিঁড়ে ও ভুরা মাখা। ঐ ছেলেটিই পরিবেশক।

সুরেনবাবু বললেন—একি? স্টীমার যে ওদিকে ছাড়ে।

—না, সেদিকে আমার হুঁস আছে। এখনও ভোঁ দেয় নি তো?

শরৎচন্দ্র এবার উঠে দোকানীকে টাকা দিলেন।

ছেলেটির মজুরি দিয়েও, কিছু খুচরা পয়সা দোকানীর কাছ থেকে তাঁর পাওনা হ'ল।

দোকানী সেই পয়সা ফেরৎ দিতে এলে, শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—দেনে নেহি হোগা, উহা তুমহারা নাফামে গিয়া।

শুনে দোকানী প্রগাঢ় বিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শরৎচন্দ্র ভেনাসে ফিরে এসে সুরেনবাবু প্রভৃতিকে বললেন—স্টীমার-ঘাটে নেমে দেখি, একদল কুকুর ছুটে আসছে। দেখে মনে হ'ল, তারা যেন কতদিন খেতে পায় নি। ইচ্ছা হ'ল, ঐ কুকুরগুলোকে কিছু খাওয়াই। দেখলাম, দোকানে দই চিঁড়ে আছে, তাই লেগে গেলাম।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতে যোগদানের জন্য হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্রও দিল্লী গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র দিল্লী গিয়ে সেখানে যাঁর বাড়িতে ছিলেন, সেখানকার একদিনের একটি ঘটনা বলছি—

মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হয়েছে। টেবিলে ভোজ্যবস্তু সমস্তই সাজানো। শরৎচন্দ্র খেতে যাবেন কি এমন সময় কোথা থেকে একটা ক্ষুধার্ত রোগা কুকুর সামনে এসে দাঁড়াল।

শরৎচন্দ্র তখন এক গ্রাসও মুখে না দিয়ে এবং উপস্থিত কাকেও কিছু না ব'লে নিজের অন্নের থালাটি কুকুরের সামনে ধ'রে দিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই কাণ্ড দেখে গৃহকর্তা এবং উপস্থিত আরও কেউ কেউ — আ-আ-আ কি করছেন, কি করছেন — ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র কারও কথায় কান না দিয়েই নিজের সমস্ত খাদ্যই কুকুরটাকে দিয়ে দিলেন। দিয়ে গৃহকর্তাকে বললেন — আমার খাওয়ার জন্য আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমার পেট ভার আছে।

গৃহকর্তা বিমর্ষ হয়ে বললেন — ওটা একটা রাস্তার কুকুর। কারও পোষা কুকুর নয়।

তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন — হতভাগা চাকরগুলো সব গেল কোথায়? একটা রাস্তার কুকুর বাড়ির ভিতরে এসে গেল, কেউ দেখতে পেল না!

শরৎচন্দ্র গৃহকর্তাকে আবার বললেন — আমার ক্ষুধার চেয়ে ওর ক্ষুধা অনেক বেশি। ওরই খাওয়া দরকার।

এদিকে অভুক্ত কুকুরটা ততক্ষণে খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

এই কাহিনীটি আমি প্রথমে শুনি 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। পরে সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়ের কাছেও শুনি। ভবানীবাবু কেদারবাবুর মুখে শুনেই আমাকে বলেছিলেন।

কেদারবাবু সেবার দিল্লী কংগ্রেসে গিয়েছিলেন এবং এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

এবার শরৎচন্দ্র কাশীতে একবার কিভাবে পথের কুকুরকে ডেকে ডেকে লুচি মোণ্ডা খাইয়েছিলেন, তার একটা কাহিনী বলছি। এ কাহিনীটি যাঁর বাড়িতে ঘটেছিল, সেই 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এ কাহিনী আমাকে একাধিকবার বলেছেন। কাহিনীটি এই —

শরৎচন্দ্র একবার কাশীতে এই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন ছিলেন। সেই সময় সুরেশবাবুদের পাড়ায় অনেকগুলো কুকুর ছিল, যেগুলো কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তাদের কোন মনিব বা প্রভু ছিল না। তারা একরূপ খেতেই পেত না। সেই সব পথের কুকুরকে ডেকে, কেউ খেতে দিত না। তাই তাদের খাওয়ার কষ্ট দেখে, শরৎচন্দ্র একদিন একটা দোকানে গিয়ে তাদের জন্য অনেক টাকার লুচি, পুরি, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি কেনেন। তারপর একটা মুটের মাথায় ঐ সব চাপিয়ে সুরেশবাবুদের বাড়ির যে রকটা বড় রাস্তার দিকে ছিল, সেখানে নিয়ে আসেন। সেখানে বসে শরৎচন্দ্র পাড়ার ঐ পথের কুকুরগুলোকে

ডেকে ডেকে পেট পুরে লুচি মোণ্ডা খাওয়ালেন।

শরৎচন্দ্রের এই ব্যাপার দেখে পথচারী ভদ্র-অভদ্র উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র কাকেও কিছু না ব'লে, শুধু সুরেশবাবুকে বললেন—'দেখ সুরেশ, পথের কুকরগুলোকে দেখলে আমার যেন কেমন কষ্ট হয়। এদের দেখবার কেউ নেই। কেউ এদের আদর করে কোন দিনই খেতে দেয় না। বরং দেখতে পেলে অনেকেই এদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। বেচারাদের জীবন সত্যিই বড় দুঃখের। আমার যদি টাকা থাক্‌ত, তাহলে আমি এদের জন্য একটা অন্নসত্র খুলে দিতাম।'

এই হ'ল, নজরুলের ভাষায় সুরেনবাবুর কাছে শোনা, শরৎচন্দ্রের পথের কুকুরদের জন্য পরিকল্পিত মঠ—ফ্রি অব্ চার্জ।

নজরুলের কয়েকটি কবিতা ও গান

(বইয়ে প্রসঙ্গতঃ এইগুলির কথা আছে।)

আগমনী

একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রণরণ রণ ঝন ঝন!
সে কি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি'
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি'
ওঠে চোটে চোটে, ছোটে লোটে ফোটে
বহ্নি-ফিণিকি চমকি' চমকি'
ঢাল তলোয়ারে খনখন![১]
সদা গদা ঘোরে বোঁও বনবন
শোঁও শন শন!
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
রণ ঝনঝন ঝন রণরণ!

হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায়
তালে তালে
ওই পালে পালে
ধরা কাপে দাপে।
জাঁকে মহাকাল কাঁপে থরথর!
রণে কড়কড় কাড়া খাঁড়া-ঘাত
শির পিশে হাঁকে রথ-ঘর্ঘর-ধ্বনি ঘররর!

গুরু গরগর বোলে ভেরী তূরী;

"হর হর হর"
করি চীৎকার, ছোটে সুরাসুর-সেনা হনহন!
ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি'
হু-হু-হু-হু-হু-হু শনশন!
ছোটে সুরাসুর-সেনা হন হন!
বোঁও বন বন
শোঁও শন শন
হো হো ঝনননন রণঝনঝন রণননরণ ঝনরণ!
তাতা থৈথৈ খল খলখল[২]
নাচে রণরঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে,
ধকধক জ্বলে জ্বল জ্বল
বুকে মুখে চোখে রোষ-হুতাশন!
রোস্ কোথা শোন্!

ঐ ডম্বরু-ঢোলে ডামাডাম বোলে,
ব্যোম-মরুৎ-স-অম্বর দোলে,
যম-বরুণ কী কল-কল্লোলে
চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে, চরণ-ভঙ্গে
সৃষ্টি সে টলে টলমল।
ওকি বিজয়-ধ্বনি সিন্ধু গরজে কলকল
কল কলকল!

ওঠে কোলাহলল,
কূট হলাহল
ছোটে মন্থনে পুনঃ রক্ত-উদধি
ফেনা-বিষ ক্ষরে গলগল।
টলে নির্বিকার সে বিধাতৃরো গো
সিংহ-আসন টলমল!
কা'র আকাশ-জোড়া ও আনত-নয়ানে[৩]
করুণা অশ্রু ছলছল।

বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর
ঝম্ ঝম্,
নাচে ধূর্জটি সাথে প্রমথ[4] ব-ব-ব বম্ বম্!
লাল লালে-লাল ওড়ে ঈশানে নিশান
যুদ্ধের,
ওঠে ওঙ্কার রণ-ডঙ্কার,
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের!
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা,
বহ্নির বান রে!
কোটি বীর-প্রাণ
ক্ষণে নির্বাণ,
তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম্ গম্!
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও
শির-দাঁড়া করে চন্ চন্।
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,
নিশীথিনী ভয়ে থম্ থম্।
বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর
ঝম্ ঝম্।

ঐ অট্ট হাসিছে রণ-চামুণ্ডা হাহা হিহি
মাঝে মাঝে হুঙ্কারে বৃংহতি-নাদ
হ্রেষা-রব চিঁহি চিঁহি হিঁহিঁ
বজ্রের মার, করকা-পাত!
'কর্ আঘাত,
কর্ আঘাত,
কর নিপাত,
বহ্নি-ঘাত,
মা'রের ওপর মা'র হানো, বাঃ সাব্বাস
হাস্! কাঁপে দেখ ভয়ে?
যেন শীতে, হিহি ইহি ইহি!
কট্ কট্ কট্
পট্ পট্ পট্

গিরা ছিঁড়ে হাহা নড়ে ছট্‌ফট্‌
হুর্‌র্‌! হুর্‌র্‌!! হুর্‌র্‌!!!"

হোহো কাটা-পাঁটা যেন ধড়্‌ ফড়্‌ করে
দূর্‌র্‌! দূর্‌র্‌!! দূর্‌র্‌!!!
ঐ ওঠে দানবেরা ঘন চীৎকারি'
ধিক্কারি' পুনঃ হানে টিট্‌কারি রে!
যেন কোটি নাগ-বিষ ফুৎকার
ওঠে মৃত্যু-আহত নিশাসে
নিশাসে ঘুৎকার।
নর-মুণ্ড-মালিনী চণ্ডী হাসিছে হাহা হাহা
হাহা হিহি হিহি,
হোহো হাহা হাহা হাহা হিহি হিহি!

অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-সেনা যত
হত আহত করে রে দেবতা সত্য!
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল
মাতাল রক্ত-সুরায়।
ত্রস্ত বিধাতা, মস্ত পাগল
পিণাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায়!
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়!!

চিতার উপরে চিতা সারি সারি,
চারিপাশে তারি
ডাকে কুক্কুর গৃধিনী শৃগাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!

আজ রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ
প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে

বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিশে
যায় শির পশুর।
'নাই দানব
নাই অসুর,—
চাই নে সুর,
চাই মানব।'
বরাভয়-বাণী ঐ রে কা'র
শুনি, নহে হৈ রৈ এবার!
ওঠ্ রে ওঠ্,
ছোট্ রে ছোট্!
শান্ত মন,
ক্ষান্ত রণ!

খোল তোরণ,
চল্ বরণ
কর্‌বো মায়;
ডর্‌বো কা'য়?
ধর্‌বো পা'য় কার্ সে আর,
বিশ্ব মা'ই পার্শ্বে যার?

আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি
তাঁহারি চাওয়া,
ঐ শেফালিকা-তলে
কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন-
হাওয়া!
এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী
কুমারী কমলা[৫] ঐ
সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা এলো
বীণা-বাণী অমলা ঐ।[৬]
এসেছে গণেশ, এসেছে মহেশ,
বাস্‌রে বাস্!

জোর উছাস!!
এলো সুন্দর সুর-সেনাপতি
সব মুখ এযে চেনা চেনা অতি।
বাস্‌রে বাস্‌
জোর উছাস॥

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,
তব সীমা লয় হোক
ভুলে যাও শোক—চোখে জল ব'ক্
শান্তির—আজি শান্তি-নিলয়
এ আলয় হোক!
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন-গীত্ চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত্ চলুক!!
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম
নিখিল ব্যোম্।
স্বা-গতম্!
স্বা-গতম্!!
মা-তরম্!
মা-তরম্!!
ঐ ঐ ঐ বিশ্ব-কণ্ঠে বন্দনা-বাণী
লুঠে—'বন্দে মাতরম্!!!'

'বাংলা দেশ'এর বাংলা একাডেমি থেকে আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী—১ম খণ্ডে' এই কবিতাটি আছে। এই বইয়ে উদ্ধৃত 'আগমনী' কবিতায় যে যে পংক্তিতে ১, ২, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়েছি, সেই পংক্তিগুলিতে উক্ত বাংলা একাডেমির বইয়ে যেরূপ পাঠ দেখা যায়, তা এখানে দিলাম—

১. ঢাল তলোয়ারে ছন ছন
২. তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ চল খল খল
৩. কার আকাশ জোড়া ও আয়ত নয়ানে
৪. নাচে ধূর্জটি সাথে প্রথম
৫. কুমারী অমলা ঐ
৬. বীণা-পাণি অ-মলা ঐ

এই 'আগমনী' কবিতাটি ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

'উপাসনা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর নজরুল আবার এই কবিতাকে প্রকাশ করেন, তাঁর নিজের সম্পাদিত ১৩২৯ সালের ৯ই আশ্বিন তারিখের 'ধূমকেতু' পত্রিকায়। পরে ঐ বছরই কার্তিক মাসে প্রকাশিত তাঁর 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন এই কবিতা। ১ম সংস্করণ 'অগ্নিবীণা'র প্রকাশক ছিলেন নজরুল নিজেই। পরে এই বইএর প্রকাশক হয় ডি. এম. লাইব্রেরি। ডি. এম. লাইব্রেরি নজরুলের কাছ থেকে 'অগ্নিবীণা'র সর্বসত্ত্ব কিনে নেয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'উপাসনা' এবং 'ধূমকেতু' পত্রিকা আছে। এই পত্রিকা দুটি দেখার জন্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

১ম সংস্করণ 'অগ্নিবীণা'র এই কবিতার সঙ্গে পরের সংস্করণ ডি. এম-এর 'অগ্নিবীণা'য় প্রকাশিত এই কবিতা মিলিয়ে দেখেছি, বেশ কয়েক জায়গায় কবিতার কয়েক পংক্তি ক'রে বইয়ে নেই।

মূল কবিতার প্রথম দিকে 'ঢাল তলোয়ার ঘন ঘন' পংক্তির পর এই দুটা পংক্তি আছে— সদা গদা ঘোরে বোঁও বনবন

শোঁও শন শন।

আমার সংগ্রহের ডি. এম. লাইব্রেরির বইয়ে এ দুটা পংক্তি নেই।

মূল কবিতায়—'ছোটে সুরাসুর-সেনা হন হন।'

এর পর আছে— বোঁও বন বন

শোঁও শন শন

হো হো ঝনননন রণ ঝনঝন রণননরণ ঝনরণ

ডি. এম. লাইব্রেরির ঐ বইয়ে এ ক' পংক্তি নেই।

মূল কবিতায়— 'বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর

ঝম্ ঝম্।

ঐ অট্ট হাসিছে রণ-চামুণ্ডা হাহা হিহি হিহি

থেকে 'হোহো হাহা হাহা হাহা হিহি হিহি' পর্যন্ত টানা এই ২৭ পংক্তি ডি. এম. লাইব্রেরির অগ্নিবীণার 'আগমনী'তে নেই।

মূল কবিতায় এক জায়গায় 'উৎপলাক্ষী কুমারী কমলা' ডি. এম. লাইব্রেরির বইয়ে হয়েছে—'উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা।' আর 'বীণা-বাণী অমলা' হয়েছে—'বাণী-পাণি অমলা'।

বিদ্রোহী

এই বইয়ে 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ' প্রবন্ধে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলেছি। 'বিদ্রোহী' নজরুলের 'আগমনী' কবিতার মতই একটি দীর্ঘ কবিতা, এই কবিতার প্রথম স্তবকটি হ'ল—

বল বীর—
বল উন্নত মম শীর!
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ছেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ভেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমার কাছে ডি. এম. লাইব্রেরির প্রকাশিত ১২শ সংস্করণের যে 'অগ্নিবীণা' বইটি আছে, তাতে দেখছি 'বিদ্রোহী' কবিতার ৫৩ পংক্তির পর এই পংক্তি দুটি বাদ গেছে—

আমি সন্ন্যাসী, সুর সৈনিক
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।

'বিদ্রোহী' কবিতা যেমন 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'ও প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল করিম লিখেছেন—'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'বিদ্রোহী'র ৯১-৯৪ সংখ্যক চরণগুলি ছিল নিম্নরূপ—

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি হা-হা হা-হা হি-হি-হি-হি,
তাজি বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চিঁ-হি হিঁ-হি চিঁ-হি হিঁ-হি।

'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'বিদ্রোহী'তে— 'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার' পংক্তিটির পূর্বে ছিল এই পাঁচটি পংক্তি—

আমি   উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল
আমি   বিবসন, আজ ধরাতল নভ ছেয়েছে আমারি জটাজাল।
        আমি ধন্য! আমি ধন্য!!
আমি   মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর, বিদ্রোহী সৈন্য,
        আমি ধন্য! আমি ধন্য॥

'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় সংস্করণেও এই পাঁচটি পংক্তি ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে এই পংক্তিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

আনন্দময়ীর আগমনে

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মার্‌ছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আস্‌বি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টান্‌ছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নাম্‌বে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধ'রে?
বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয়-বছরী ফন্দি-কারায়,[১]
চক্র তাহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি হারায়।
মহেশ্বর আজ সিন্ধু-তীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে[২]
অরবিন্দ-চিত্ত তাঁহার ফুট্‌বে কখন কে সে জানে।
সদ্য অসুর-গ্রাস-চ্যুত ব্রহ্মা চিত্তরঞ্জনে হায়[৩]
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ নদীয়ায়।
শান্তি শুনে তিক্ত এ-মন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,
মরার দেশের মড়া-শান্তি, সে ত আছেই, কাজ কি তবে?
শান্তি কোথায়? শান্তি কোথায় কেউ জানি না
মা গো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা!
দেবতারা আজ জ্যোতিহারা, ধ্রুব তাঁদের যায় না জানা,
কেউ বা দৈব-অন্ধ মা গো, কেউ বা ভয়ে দিনে-কানা।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব-রাজার অত্যাচারে,[৪]
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে।

রবির শিখা[৫] ছড়িয়ে পড়ে দিক হ'তে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে।
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্ত্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মার্‌ছে কোঁড়া।
বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,[৬]
বুড়ি-গঙ্গার পুলিন[৭] বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজায়।
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব-জুতো
মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা-গুঁতো।
দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মস্‌জিদে যায়, নামাজ পড়ে,
নাইক খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ সব বন্দী-গড়ে।
'লানত'-গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুম-বাজে
ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরাণ ভাঁজে।
তাজ-হারা যার নাঙ্গাশিরে গর্‌মা গরম পড়্‌ছে জুতি
ধর্ম-কথা বল্‌ছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব পুঁথি!
উৎপীড়কে প্রণাম ক'রে শেষে ভগবানে নমি,
হিজ্‌ড়ে ভীরুর ধর্ম-কথার ভণ্ডামীতে আস্‌ছে বমি!
টিকটিকির ঐ ল্যাজুর সম দিগ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেব্‌তার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি!
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগ্‌লি খেয়ে ভরায় উদর
টিকটিকি হয়, বিষ্ঠা কি নাই—ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধোর!
আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, 'দোহাই হুজুর মলাম মলাম।'
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।
হান্‌ তরবার, আন্‌ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ রক্ত দে মা, রক্ত দেখা!
লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধিদাতা গণেশ-টনেশ চাই না রণে।
ঘোম্‌টা-পরা কলাবৌ-এর গলা ধ'রে দাও ক'রে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ূর-চড়া জামাই ঠাকুর?
দূর করে দে, দূর করে দে, এসব বালাই সর্বনাশী,
চাই না'ক ঐ ভাং-খাওয়া শিব, নেক দিয়ে তাঁয় গঙ্গামাসী।
তুই একা আয় পাগলী বেটি তাথৈ তাথৈ নৃত্য ক'রে,

রক্ত-তৃষায় 'ময় ভুখা হুঁ'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধ'রে।
'ময় ভুখা হুঁ'র রক্তক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুরবাগে শিখ-সেনা তোর হুঙ্কারে ঐ 'জয় আকালি'।
এখনো তোর মাটির গড়া মৃণ্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি,
দু'চোখপুরে জল আসে মা, আর কতকাল কর্‌বি দেরি?
মহিষাসুর বধ ক'রে তুই, ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিস্ নি তা, ত্রেতাযুগে টল্‌ল আসন রামের দুখে।
আর এলিনে রুদ্রাণী তুই জানিনে কেউ ডাক্‌ল কিনা,
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ 'ময় ভুখা হুঁ'র রক্ত-বীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীরকাশিমের প্রাণ বলিদান,
চণ্ডী! নিলি যোগমায়া-রূপ, বল্‌ল সবাই বিধির বিধান।
হঠাৎ কখন উঠ্‌ল ক্ষেপে বিদ্রোহিণী ঝান্সী-রাণী,
ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলি নে তুই মা ভবানী।
এম্‌নি ক'রে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা?
পাষাণ বাপের পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভুজা।
বছর বছর এই অভিনয় অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস আশিস কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে।
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায় নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী, এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দূর ক'রে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা।
সেই দিন হবে জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজ্‌বে বোধন-বাজ্‌না সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ময় ভুখা হুঁ' মায়ি' ব'লে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রাণীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী!!

১. অসহযোগ আন্দোলনের সময় যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুরের চৌরীচৌরায় একদল লোক ২১ জন পুলিশ ও একজন চৌকিদারকে পুড়িয়ে মারে। এর পরেই ১৯২২ এর ১০ই মার্চ ইংরাজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে এবং ছ বছরের জেল দেয়। জেলে গান্ধীজী কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'লে ছ' বছরের আগেই ১৯২৪ সালে মুক্তি পান।
২. পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীঅরবিন্দ।

৩. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

৪. ১৯২০ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় তখনকার ইংরাজ সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। বেতন ছিল পাঁচ হাজার টাকা।

৫. রবীন্দ্র-সাহিত্য।

৬. বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তিনি আন্দামান জেলে থাকার সময় কবিতার বই লিখেছিলেন—'দ্বীপান্তরের বাঁশী।'

৭. ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস।

নজরুলের বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে এই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি সমস্ত উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে এই কবিতার একাদশ পংক্তি ভুল ছাপা হয়েছে এইভাবে—

দন্ত-অসুর গ্রাস চ্যুত ব্রহ্মা-চিত্ত রন্ধজনে হায়

ঐ বইয়ে এই কবিতায় এইরূপ আরও দু একটা সামান্য ভুল আছে।

'হরফ' প্রকাশিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' গ্রন্থেও এই কবিতায় কয়েকটা ছাপার ভুল হয়েছে।

কয়েকটি গান

নজরুল নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকে এই গানগুলি লিখে দিয়েছিলেন। গানগুলিতে নিজে সুরও দিয়েছিলেন—

১

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী॥
ঐ বাজে তব আরতি বোধন,
কোটী অসহায় কণ্ঠে রোদন।
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ,
বেদনা-বিহারী এস নারায়ণ,
কংস-কারার অন্ধ-প্রাকার-বন্ধন অপসারি॥

২

মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা!
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা,

জাগো দেবতা — জাগো দেবতা॥
শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা॥
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা।
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী,
অশ্রুতে অশ্রুত শঙ্খধ্বনি,
পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী আজি দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা।

৩

কারা পাষাণ ভেদি, জাগো নারায়ণ।
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ॥
হত্যা যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু ম্রিয়মাণ।
শোণিত-লেখা জাগে, নাহি কি ভগবান?
মৃত্যুক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ।

৪

পূজা-দেউলে মুরারী,
শঙ্খ নাহি বাজে!
ভগ্ন ঘট, শূন্য থালা
পুণ্য-লোক রক্তে ঢালা,
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে
দাও শরণ তব চরণ মরণ মাঝে

৫

নাহি ভয়, নাহি ভয়।
মৃত্যু সাগর মন্থন শেষ, আসে মৃত্যুঞ্জয়।
হত্যায় আসে হত্যা-নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,
অন্ধকারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ময়।।
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখিজল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়।
ধ্বংসের মাঝে শঙ্খ বাজায়
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়
নবীন অভ্যুদয়।।

৬

তিমির বিদারি অলক-বিহারী কৃষ্ণ-মুরারী, আগত ওই
টুটিল আগল, নিখিল পাগল, সর্বসহা আজি সর্বজয়ী।।
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়
কাল রাখাল নাচে থৈ তা থৈ।।
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব——নমো নমঃ
অরির পুরীমাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
অন্ধ-কারায় এল বন্ধ-বিমোচন।
ধরি অজানা পথ, আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে মাভৈঃ।।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কোরাস !

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ-তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গরজায় গুরু বাজ
পশ্চাৎ-পথযাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ !
কাণ্ডারী, তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ ?
ক'রে হানাহানি, তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার !

৫

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।

উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

কৃষ্ণনগর
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

এই গানটি ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৬এর ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে উদ্বোধন সংগীত হিসাবে নজরুল এই গানটি গেয়ে ছিলেন।

১. 'বাংলা দেশ'এর বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীতে [২য় খণ্ড, ২য় প্রকাশ] ছাপার ভুলে 'পুঞ্জিত অভিমান' হয়েছে 'পুঞ্জিত অভিযান।'